চাচা কাহিনী

চাচা কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলী

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা

শ্রীমতী রাবিয়া খাতুনের করকমলে—

ভালোবাসার সহিত

কাহিনী সূচী

স্বয়ংবরা

বার্লিনের বড় রাস্তা কুরফুর্স্টেন্ডাম্ যেখানে উলান্ডস্ট্রাসের সঙ্গে মিশেছে, সেখান থেকে উলান্ডস্ট্রাসে উজিয়ে দু-তিনখানা বাড়ি ছাড়ার পরই 'Hindusthan Haus' অর্থাৎ 'Hindusthan House' অর্থাৎ 'ভারতীয় ভবন'। আসলে রেস্তোরাঁ, দা-ঠাকুরের হোটেল বললেই ঠিক হয়। জর্মনি শুয়োরের দেশ, অর্থাৎ জর্মনির প্রধান খাদ্য শূকর মাংস। হিন্দুস্থান হাউসে সে মাংসের প্রবেশ নিষেধ। সেই যে তার প্রধান গুণ তা নয়, তার আসল গুণ, সেখানে ভাত ডাল মাছ তরকারি মিষ্টি খেতে পাওয়া যায়। আর যেদিন ঢাকার ফণি গুপ্ত বা চাটগাঁর আব্দুল্লা মিয়া রসুইয়ের ভার নিতেন সেদিন আমাদের পোয়াবারো, কিন্তু উলান্ডস্ট্রাসেতে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। জর্মনিতে লাল লঙ্কার রেওয়াজ নেই, ('পাপ্রিকা' নামক যে লাল আবীর লঙ্কার পদ পেতে চায় তার স্বাদ আবীরেরই মতো) কাজেই হিন্দুস্থান হৌসে লঙ্কা-ফোড়ন চড়লে তার চতুর্দিকে সিকি মাইল জুড়ে হাঁচি-কাশি ঘন্টাখানেক ধরে চলত। পাড়াপড়শীরা নাকি দু-চারবার পুলিশে খবর দিয়েছিল, কিন্তু জর্মন পুলিশ তদারক-তদন্ত করতে হলে খবর দিয়ে আসত বলে আমরা সেদিনকার মতো লঙ্কার হাঁড়িটা 'ডয়েটশে ব্যাঙ্কে' জমা দিয়ে আসতুম। শুনেছি শেষটায় নাকি প্রতিবেশীদের কেউ কেউ লঙ্কা-ফোড়ন চড়লে গ্যাস-মাস্ক পরত। জর্মনি বৈজ্ঞানিকদের দেশ।

ঢুকেই রেস্তোরাঁ। গোটা আষ্টেক ছোট ছোট টেবিল। এক একটা টেবিলে চারজন লোক খেতে পারে। একপাশে লম্বা কাউন্টার, তার পিছনে হয় ফণি নয় আব্দুল্লা লটরচটর করত, অর্থাৎ অচেনা খদ্দের ঢুকলে তার সামনে ব্যস্ত-সমস্ততার ভান করত। কাউন্টারের পাশ দিয়ে ঢুকে পিছনে রান্নাঘর। রেস্তোরাঁর যে দিকে কাউন্টার তার আড়াআড়ি ঘরের অন্য কোণে কয়েকখানা আরামকেদারা আর চৌকি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। এ কুণ্ডলীর চক্রবর্তী চাচা, উজির-নাজির গুটি ছয় বাঙালি।

অবাঙালিরা আমাদের আড্ডায় সাধারণত যোগ দিত না। তার জন্য দায়ী চাচা। তিনি কথা বলতেন বাঙলায়, আর অবাঙালি থাকলে জর্মনে। এবং সে এমনি তুখোড় জর্মন যে তার রস উপভোগ করবার মতো ক্ষমতা খুব কম ভারতীয়েরই ছিল। ফলে

অবাঙালিরা দুদিনের ভিতরই ছিটকে পড়ত। বাঙালিরা জানত যে তারা খসে পড়লেই চাচা ফের বাঙলায় ফিরে আসবেন। তাই তারা তাঁর কটমটে জর্মন দুদণ্ডের মতো বরদাস্ত করে নিত।

জব্বলপুরের ঔপনিবেশিক বাঙালি শ্রীধর মুখুয্যে তাই নিয়ে একদিন ফরিয়াদ করে বলেছিল, 'বাঙালি বড্ড বেশি প্রাদেশিক। আর পাঁচজন ভারতবাসীর সঙ্গে মিলে-মিশে তারা ভারতীয় নেশন গড়ে তুলতে চায় না।'

চাচা বলেছিলেন, 'প্রাদেশিক নয়, বাঙালি বড্ড বেশি নেশনাল। বাংলাদেশ প্রদেশ নয়, বাংলাদেশ দেশ। ভারতবর্ষের আর সব প্রদেশ সত্যকার প্রদেশ। তাদের এক-একজনের আয়তন, লোকসংখ্যা, সংস্কৃতি এত কম যে পাঁচটা প্রদেশের সঙ্গে জড়াজড়ি করে তারা যদি 'ইন্ডিয়ান নেশন, ইন্ডিয়ান নেশন' বলে চেল্লাচেল্লি না করে, তবে দুনিয়ার সামনে তারা মুখ দেখাতে পারে না। এই বার্লিন শহরেই দেখ। আমরা জন চল্লিশ ভারতীয় এখানে আছি। তার অর্ধেকের বেশি বাঙালি। মারাঠি, গুজরাতি কটা, এক হাতের এক আঙুল, জোর দু আঙুলে গোনা যায়। ত্রিশটা লোক যদি বিদেশের কোনো জায়গায় বসবাস করে তবে অন্তত তার পাঁচটা একজায়গায় জড়ো হয়ে আড্ডা দেবে না? মারাঠি, গুজরাতিরা আড্ডা দেবার জন্য লোক পাবে কোথায়?'

আড্ডার পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলল, 'লোক বেশি হলেও তারা আর যা করে করুক, আড্ডা দিতে পারত না। আড্ডা জমাবার বুনিয়াদ হচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপ, কাছারি-বাড়ি, টঙ্গিঘর, বৈঠকখানা—এককথায় জমিদারী প্রথা।'

চাচা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাই বুঝি তুই কলেজ পালিয়ে আড্ডা মারিস? তোদের জমিদারীর সদর-খাজনা কত রে?'

সরকার বলল, 'কাণাকড়িও না। জমিদারি গেছে, আড্ডাটি বাঁচিয়ে রেখেছি। আমার ঠাকুরদাকে এক সায়েব আদালতে জিজ্ঞেস করেছিল তাঁর ব্যবসা কী? বুড়ো বলেছিল, সেলিং।'

মুখুয্যে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

'তার মানে, তিনি জমিদারী বিক্রি করে করে জীবনটা কাটিয়েছেন। তাই বাবাকে কোনো সদর-খাজনা দিতে হয়নি।'

হিন্দুস্থান হৌসে মদ বিক্রি হত না। কিন্তু বিয়ার বারণ ছিল না। সূর্য রায় বেশিব ভাগ সময়ই বিয়ারে গলা ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে নাক দিয়ে ধুঁয়ো ছাড়তেন। চাচার পরেই জ্ঞানগম্যিতে তাঁর প্রাধান্য আড্ডায় ছিল বেশি। চাচার জর্মনজ্ঞান ছিল পাণ্ডিত্যের জ্ঞান, আর রায়ের জ্ঞান ছিল বহুমুখী। বার্লিনের মতো শহরের বুকের উপর বসে তিনি কাগজে জর্মন কলাম লিখে পয়সা কামাতেন। ফোনে কথা শুনে শব্দতাত্ত্বিক হের মেনজেরাট্

পর্যন্ত ধরতে পারেননি যে জর্মন রায়ের মাতৃভাষা নয়।

চোখ বন্ধ রেখেই বললেন, 'হক কথা কয়েছ সরকার। সবই বিক্রি, সব বেচে ফেলতে হয়। খাই তো দুফোঁটা বিয়ার, কিন্তু বিক্রি করে দিতে হয়েছে বেবাক লিভারখানা।'

আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া ছিল গোলাম মৌলা। রায়ের 'প্রতেজে' বা 'দেশের ছেলে'। সে সবসময় ভয়ে ভয়ে মরত, পাছে রায় বিয়ারে বানচাল হয়ে যান। চুপেচুপে বলল, 'মামা, বাড়ি চলুন।'

রায় চোখ মেললেন। একদম সাদা। বললেন, 'তুই বুঝি ভয় পেয়েছিস আমি মাতাল হয়ে গিয়েছি! ইষ্ বিন্ ইন্ মাইনেম্ নরমালেন্ ৎসুস্টান্ট, ডাস্ হাইস্ট, আইন বিস্‌শেন্ ব্লাউ। আমি আমার সাধারণ (নর্মাল) অবস্থায় আছি, অর্থাৎ ঈষৎ নীল।' তার মানে, মনে একটু রঙ লেগেছে, এবং ঐ রঙ লাগানো অবস্থাই ছিল তাঁর নর্মাল অবস্থা। মদ্যসংক্রান্ত বিষয় রায় কখনো বাংলায় বলতেন না। তাঁর মতে বাংলায় তার কোনো পরিভাষা নেই। পান্তা ভাতে কাঁচা লঙ্কা চটকে এক সানকে গিলে এলুম—যেমন জর্মনে বলা যায় না, তেমনি মদ্যসংক্রান্ত ব্লাউ (নীল), বেজ়ফেন্ (টে-টম্বুর), ফল্ (সম্পূর্ণ), বেক্রঙ্কেন্ (ডুবে-মরা) কথার বাংলা করলেও বাংলা হয় না।

চাচা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার অ্যাবনর্মাল অবস্থাটা দেখবার বাসনা আমার মাঝে মাঝে হয়।'

রায় আঁৎকে উঠে বললেন, 'ষাট, ষাট! আমি মরব, আপনিও মরবেন। গেল সাত বছরে একদিন এক ঘন্টার তরে বিয়ার না খেয়ে আমি অ্যাবনর্মাল অবস্থায় ছিলুম। গিয়েছিলুম ফেরবেল্লিনার প্লাৎসের মসজিদে—ঈদের পরবে।* মদ খেয়ে মসজিদে যাওয়ার সাহস ওমর খাইয়ামেরও ছিল না, আমি তো নস্যি।' বলে ওস্তাদরা যে রকম মিয়া (তানসেন) কী তোড়ী গাইবার সময় কানে হাত ছোঁয়ান সেইরকম কানমলা খেয়ে নিলেন। বললেন, 'ফল? ফেরার পথে মিস জমিতফকে বিয়ের কথা দিয়ে ফেলেছি। অ্যাবনর্মাল—'

কিন্তু তারপর রায় কী বলেছিলেন, সে কথা শোনে কে? রায়ের পক্ষে খুন করা অসম্ভব নয়, অবস্থাভেদে গাঁটও হয়তো তিনি কাটতে পারেন, কিন্তু তিনি যে একদিন বিয়ের ফাঁদে পা দেবেন, এত বড় অসম্ভব অবস্থার কল্পনা আমরা কোনো দিন করতে পারিনি। স্বয়ং হিন্ডেনবুর্গ যদি তখন গোঁফ কামিয়ে আমাদের আড্ডায় এসে উপস্থিত হতেন তাহলেও আমরা এতদূর আশ্চর্য হতুম না।

* ফেরবেল্লিনার প্লাৎসের মসজিদে ঈদ-পর্ব উপলক্ষে বার্লিনের আরব, ইরানী, ভারতীয় সব মুসলমান জড়ো হয়। অমুসলমানের মধ্যে প্রধানত যায় বাঙালি হিন্দু।

রায় তখন লড়াইয়ে-জেতা বীরের গর্জনে হুঙ্কার দিয়ে বলছেন, 'দেখতে চান আমার অ্যাবনর্মাল অবস্থা আরো দু-চারবার? সরকারী লাইব্রেরী পোড়ানো, আইনস্টাইনকে খুন, কিছুই বাদ যাবে না। তবু যদি—'

চাচা বললেন, 'বড় ভাবিয়ে তুললে হে রায়সাহেব!'

আমরা তখন সবাই কলরব করে রায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কেউ বলছে 'এমন সুন্দরী সহজে জোটে না', কেউ বলছে, 'ম্যাথম্যাটিকস যা জানে,' কেউ বা বলে, 'কী মিষ্টি স্বভাব!'

সরকার বলল, 'ওহে গোলাম মৌলা, রাধা কেষ্টর কে হয় জানো?'

চাচা বললেন, 'বড় ভাবিয়ে তুললে হে রায়সাহেব!'

দু-দুবার চাচা যে কেন 'ভাবিত' হলেন আমরা ঠিক ধরতে পারলুম না। রায় যে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তা নিয়ে আশ্চর্য হওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কী আছে?

চাচার সবচেয়ে ন্যাওটা ভক্ত গোঁসাই বলল, 'আপনি তো বিয়ে করেননি, কখনো এনগেজডও হননি। তাই আপনার ভয়, ভাবনা—'

চাচা বললেন, 'আমার ফাঁসি হয়নি সত্যি, কিন্তু তাই বলে আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াইনি, তুই কী করে জানলি?'

ঠেলাঠেলির ভিতর বাসের হ্যান্ডেল ধরতে পেলে মানুষ যে রকম ঝুলে পড়ে, রায় ঠিক তেমনি চাচার জবানবন্দীর হ্যান্ডেল পেয়ে বললেন, 'উকিলের নাম বলুন চাচা, যে আপনায় বাঁচালে।'

রায়ের বিয়ের খবর শুনে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলুম, কিন্তু স্তম্ভিত হইনি। কারণ রায় স্ত্রীজাতিকে অতি সন্তর্পণে দূরে ঠেলে রাখতেন। তাই শেষ পর্যন্ত ধরা দিলেন। কিন্তু চাচা এ সব বাবদে স্ত্রী-পুরুষে কোনো তফাৎ রাখতেন না। বার্লিনের মেয়েমহলে তিনি ছিলেন বেসরকারী পাদ্রী। বরঞ্চ পাদ্রীদের সম্বন্ধে ফষ্টিনষ্টির কাহিনী মাঝে মাঝে শোনা যায়, কিন্তু চাচার হৃদয় জয় করতে যাবে কে? সে-হৃদয় তিনি বহু পূর্বেই আত্মজনের মাঝে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অতো হিস্যেদারের সম্পত্তি নিলামে উঠলেও তো কেউ কেনে না। আমরা সবাই করুণ নয়নে চাচার দিকে তাকালুম, তিনি যেন কাহিনীটা চেপে না যান।

চাচা বললেন, 'ওরকম ধারা তাকাচ্ছিস কেন? তোরা কাউকে চিনবিনে। ১৯১৯-এর কথা। আমি তখন সবে বার্লিনে এসেছি। বয়স আঠারো পেরয়নি। মাকুন্দ বলে বিনা ব্লেডে গোঁফ কামাতুম—ল্যান্ডলেডি যাতে ঘর গোছাবার সময় ক্ষেউরির জিনিসপত্র না দেখে ভাবে আমি নিতান্ত চ্যাংড়া। তার থেকেই বুঝতে পারছিস আমি কতটা অজ

পাড়াগেঁয়ে, আনাড়ি ছিলুম। একগাদা ভারতীয়ও ছিল না যে আমাকে সলা-পরামর্শ দিয়ে ওয়াকিফহাল করে তুলবে। যে দু-চারজন ছিলেন তাঁরা তখন আপন আপন ধান্দায় মশগুল—জর্মনির তখন বড় দুর্দিন।

ভাগ্যিস দু-চারটে গুঁত্তাগাঁত্তা খাওয়ার পরই হিম্মৎ সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

সাইনবোর্ডে 'গেট্রেঙ্কে' (পানীয়) শব্দ দেখে আমি বিয়ারখানায় ঢুকে দুধ চেয়ে বসেছি। কী করে জানবো বল পানীয়গুলো রূঢ়ার্থে বিয়ার-ব্রান্ডি বোঝায়। ওয়েট্রেসগুলো পাঁজরে হাত দিয়ে দু-ভাঁজ হয়ে এমনি খিলখিল করে হাসছিল যে শব্দ শুনে হিম্মৎ সিং রাস্তা থেকে তাড়িখানার ভিতরে তাকালেন। আমার চেহারা দেখে তাঁর দয়ার উদয় হয়েছিল—তোদের মতো পাষণ্ডগুলোরও হত। গটগট করে ঘরে ঢুকলেন। আমার পাশে বসে ওয়েট্রেসকে বললেন, 'এক লিটার বিয়ার বিটে (প্লীজ)!'

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিয়ার নহী পিতে?'

আমি মাথা নাড়িয়ে বললুম, 'না।'

'ওয়াইন?'

ফের মাথা নাড়ালুম।

'কিসি কিস্‌ম্‌কি শরাব?'

আমি বললুম যে আমি দুধের অর্ডার দিয়েছি।

দাড়ি-গোঁপের ভিতর যেন সামান্য একটু হাসির আভাস দেখতে পেলুম। বললেন, 'অব্ সমঝা।' তারপর আমাকে বসে থাকতে আদেশ দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন এক গেলাস দুধ হাতে নিয়ে। সমস্ত বিয়ারখানার লোক যে অবাক হয়ে তাঁর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছে, সেদিকে কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তারপর, সেই যে বসলেন গেঁট হয়ে, আর আরম্ভ করলেন জালা জালা বিয়ার-পান। সে পান দেখলে গোলাম মৌলা আর ককখনো রায়ের পানকে ভয় করবে না।

শিখের বাচ্চা, রক্তে তার তিনপুরুষ ধরে আগুন-মার্কা ধেনো, আর মোলায়েমের মধ্যে নির্জলা হুইস্কি। বিয়ার তাঁর কী করতে পারে?

লিটার আষ্টেক খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পয়সা দিয়ে বেরোবার সময়ও কোনো দিকে একবারের তরে তাকালেন না। আমি কিন্তু বুঝলুম, বিয়ারখানার হাসি ততক্ষণে শুকিয়ে গিয়েছে। সবাই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হিম্মৎ সিংয়ের দিকে তাকাচ্ছে, আর ফিসফিস প্রশংসাধ্বনি বেরুচ্ছে।

বাইরে এসে শুধু বললেন, 'অব্ ইনলোগোঁকো পতা চল্ গিয়া কি হিন্দুস্থানী শরাব ভী পি সক্তা।'

তারপর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে একখানা চেয়ারে বসালেন। নিজে খাটে শুলেন।

কান পেতে আমার দুঃখ-বেদনার কাহিনী শুনলেন। তারপর বাড়ির কর্ত্রী ফ্রাউ (মিসেস) রুবেন্‌সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মহিলাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বিধবা। খানদানী ঘরের মেয়ে এবং হিম্মৎ সিংয়ের সঙ্গে যে ভাবে কথা কইলেন তার থেকে বুঝলুম যে হিম্মৎ সিং সে বাড়িতে রাজপুত্রের খাতির-যত্ন পাচ্ছেন।

তারপর এক মাসের ভিতর তিনি বার্লিন শহরের কত সব হোমরাচোমরা পরিবারের সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিলেন, এতদিন পর সে-সব পরিবারের বেশির ভাগের নামও আমার মনে নেই। কূটনৈতিক সমাজ, খানদানী গোষ্ঠী, অধ্যাপক মণ্ডলী, ফৌজী আড্ডা সর্বত্রই হিম্মৎ সিংয়ের অবাধ গতায়াত ছিল। হিম্মৎ সিং এককালে ভারতীয় ফৌজের বড়দরের অফিসার ছিলেন। ১৯১৪-১৮র যুদ্ধে বন্দী হয়ে জর্মনিতে থাকার সময় তিনি জর্মনদের যুদ্ধপরামর্শদাতা ছিলেন। এবং সেই সূত্রে বার্লিনের সকল সমাজের দ্বার তাঁর জন্য খুলে যায়। হিম্মৎ সিং আমাকে কখনো তাঁর জীবনী সবিস্তারে বলেননি, কাজেই জর্মনরা কেন যে ১৯১৭-১৮ সালে তাঁকে মস্কো যেতে দিয়েছিল, ঠিক জানিনে। সেখান থেকে কেন যে আবার ১৯১৯ সালে বার্লিন ফিরে এলেন, তাও জানিনে। তবে তাঁকে বহুবার রুশ-পলাতক হোমরাচোমরাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে দেখেছি। সে-সব রুশদের কাছ থেকে একথাও শুনেছি যে হিম্মৎ সিং মস্কোতে যে খাতির-যত্ন পেয়েছিলেন তার সঙ্গে তাঁর বার্লিনের প্রতিপত্তিরও তুলনা হয় না। কম্যুনিস্ট বড়কর্তাদের সঙ্গে মতের মিল না হওয়াতে তিনি নাকি মস্কো ত্যাগ করেন। আশ্চর্য নয়, কারণ হিম্মৎ সিংয়ের মতো জেদী আর একরোখা লোক আমি আমার জীবনে দুটি দেখিনি।

আর আমায় লাই যা দিয়েছিলেন! ভালোমন্দ কিছুমাত্র বিবেচনা না করে আমাকে যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যেতেন, আমি বেজার হয়ে বসে রইলে রাইস্টাক্ ভাড়া করে নাচের বন্দোবস্ত করবার তালে লেগে যেতেন। আমার সর্দি হলে বার্লিন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে ডেকে পাঠাতেন, শরীর ভালো থাকলে নিজের হাতে কাবাব-রুটি বানিয়ে খাওয়াতেন।

তিন মাস ধরে কেউ কখনো সুখ-স্বপ্ন দেখেছে? ফ্রয়েড নাকি বলেন, স্বপ্নের পরমায়ু মাত্র দু-তিন মিনিট। এ তত্ত্বটা জেনেও মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারলুম না, যে-দিন হিম্মৎ সিং হঠাৎ কিছু না বলেকয়ে নিরুদ্দেশ হলেন। ফ্রাউ রুবেন্‌সও কিছুই জানেন না। বললেন, যে স্যুট পরে বেরিয়েছিলেন তাই নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কয়েকদিন পরে মার্সাই থেকে চিঠি, তাঁর জিনিসপত্র ভিখিরি-আতুরকে বিলিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে।

বহু বৎসর পরে জানতে পেরেছিলুম, আন্‌হাল্‌টার স্টেশনে তাঁর এক প্রাচীন রাজনৈতিক দুশমনকে হঠাৎ আবিষ্কার করতে পেয়ে তাকে ধরবার জন্য পিছু নিয়ে তিনি একবস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন।

হিম্মৎ সিংয়ের সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি। তাঁর কাছ থেকে কোনো দিন কোনো চিঠিও পাইনি।

তারপর আরো তিন মাস কেটে গিয়েছে। বার্লিনে যে সমাজে আমাকে চড়িয়ে দিয়ে হিম্মৎ সিং মই নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সেখান থেকে আমি লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে জখমও হলুম।

এমন সময় ফ্রাউ রুবেন্‌স একদিন টেলিফোন করে অনুরোধ জানালেন আমি যেন তাঁর সঙ্গে ক্যোনিক কাফেতে বেলা পাঁচটায় দেখা করি। বিশেষ প্রয়োজন। হিম্মৎ সিং চলে যাওয়ার পর ফ্রাউ রুবেন্‌সের সঙ্গে আমার মাত্র একদিন দেখা হয়েছিল। টেলিফোনে মাঝে মাঝে হিম্মৎ সিংয়ের খবর নিয়েছি—যদিও জানতুম তাতে কোনো ফল হবে না—কিন্তু ও-বাড়িতে যাবার মতো মনের জোর আমার ছিল না। গোঁসাইয়ের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে বার্লিনে শরৎ চাটুয্যের উপন্যাস পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতুম না বটে, কিন্তু বাঙালি তো বটি!

পাঁচটার সময় কাফে ক্যোনিকে গিয়ে দেখি কাফের গভীরতম আর নির্জনতম কোণে ফ্রাউ রুবেন্‌স বসে, আর তাঁর পাশে—এক ঝলকে যা দেখতে পেলুম—এক বিপজ্জনক সুন্দরী।

ফ্রাউ রুবেন্‌স পরিচয় দিয়ে নাম বললেন, ফ্রলাইন ভেরা গিব্রিয়াডফ।

লেডি-কিলার অর্থাৎ নটবর পুলিন সরকার জিজ্ঞেস করল, 'বিপজ্জনক সুন্দরী বলতে কী বোঝাতে চাইলেন আমার ঠিক অনুমান হল না। বার্লিনের আর পাঁচজনের জন্য বিপজ্জনক, না আপনার নিজের ধর্মরক্ষায় বিপজ্জনক?'

চাচা বললেন, 'আমার এবং আর পাঁচজনের জন্য বিপজ্জনক। তোর কথা বলতে পারিনে। তুই তো বার্লিনের সব বিপদ, সব ভয় জয় করতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিস।'

শ্রীধর মুখুয্যে আবৃত্তি করল—

মাইন হের্ৎস্‌ ইস্ট ভ়ী আঁইন বীনেনহাউস
ডী মেডেল্‌স্‌ জ়িন্ট্‌ ডী বীনেন—

হৃদয় আমার মধুচক্রের সম
মেয়েগুলো যেন মৌমাছিদের মতো
কত আসে যায় কে রাখে হিসাব বল
ঠেকাতে, তাড়াতে মন মোর নয় রত।'

রায় বললেন, 'কী মুশকিল! এরা যে আবার কবিত্ব আরম্ভ করল।'

চাচা বললেন, 'ফ্রাউ রুবেন্‌স ফ্রলাইন ভেরার পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বিশেষ করে জোর দিয়ে বললেন যে হিম্মৎ সিং যখন মস্কোতে ছিলেন তখন বসবাস করেছিলেন গিব্রিয়াডফদের সঙ্গে। আমি তখন ভেরার দিকে তাকাতে তিনিও ভালো করে তাকালেন।

ছ'মাস ধরে প্রতিদিন যে লোকটির কথা উঠতে-বসতে মনে পড়েছে তিনি এঁদের বাড়িতে ছিলেন, এই মেয়েটির চোখে তাঁর ছায়া কত শত বার পড়েছে, আমি আমার অজান্তে তাঁর চোখে যেন হিম্মৎ সিংয়ের ছবি দেখতে পাবার আশা করে ভালো করে তাকালুম।

হিম্মৎ সিংয়ের ছবি দেখতে পাইনি, কিন্তু ভেরার চোখ থেকে বুঝতে পারলুম, হিম্মৎ সিং আমার জীবনের কতখানি জায়গা দখল করে বসে আছেন সে-কথা ভেরাও জানেন। তাঁর চোখে আমার জন্য সহানুভূতি টলটল করছিল।

ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'আপনি হিম্মৎ সিংকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।'

এর উত্তর দেবার আমি প্রয়োজন বোধ করলুম না।

ফ্রাউ রুবেন্‌স তখন বললেন, 'একটি বিশেষ অনুরোধ করার জন্য আমরা দুজন আজ আপনাকে ডেকেছি। হিম্মৎ সিং আজ বার্লিনে নেই—যেখানেই হোন ভগবান তাঁকে কুশলে রাখুন—আমি ধরে নিচ্ছি তিনি যেন এখন আমাদের মাঝখানেই বসে আছেন। তাই আপনাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করছি, আজ যদি হিম্মৎ সিংয়ের কোনো প্রিয় কাজ করতে আপনাকে অনুরোধ করি আপনি সেটা করবার চেষ্টা করবেন কি?'

আমি বললুম, 'আপনাদের মনে কি সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আছে?'

ফ্রাউ রুবেন্‌স তখন বললেন, 'আমার মনে নেই! ফ্রলাইন ভেরার জন্য শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম।' ভেরা মাথা নাড়িয়ে বোঝালেন, তাঁরও কোনো প্রয়োজন ছিল না। ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন; 'ভেরা অত্যন্ত বিপদে পড়ে মস্কো থেকে বার্লিন পালিয়ে এসেছেন। রাজনৈতিক দলাদলিতে ধরা পড়ে তাঁর বাপ-মা, দু'ভাই সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছেন। এক ভাই তখন ওডেসায় ছিলেন। তিনি কোনোগতিকে প্যারিসে পৌঁচেছেন। ভেরা যদি তাঁর ভায়ের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন, তবে তাঁর বিপদের শেষ হয়। কিন্তু তাঁর কাছে রাশান পাসপোর্ট তো নেইই, অন্য কোনো পাসপোর্টও তিনি যোগাড় করতে পারেননি। জর্মন পাসপোর্ট পেলেও কোনো বিশেষ লাভ নেই। কারণ জর্মনদের ফ্রান্সে ঢুকতে দিচ্ছে না। তবে সেটা যোগাড় করতে পারলে তিনি অন্তত কিছুদিন বার্লিনে থাকতে পারতেন। এখন অবস্থা এই যে বার্লিন পুলিশ খবর পেলে ভেরাকে জেলে পুরবে। রাশাতেও ফেরৎ পাঠাতে পারে।'

আমরা সবাই একসঙ্গে আঁৎকে উঠলুম।

চাচা বললেন, 'এতদিন পরও ঘটনাটা শুনে তোরা আঁৎকে উঠছিস। আমি শুনেছিলুম ফ্রলাইন ভেরার সামনাসামনি। আমার অবস্থাটা ভেবে দেখ।'

ফ্রাউ রুবেন্স বললেন, 'এখন কী করা যায় বলুন?'

হিম্মৎ সিংয়ের কথা মনে পড়ল। আমাদের কাছে যে বাধা হিমালয়ের মতো উঁচু হয়ে দেখা দিয়েছে, তিনি তার উপর দিয়ে স্কেটিং করে চলে যেতেন। পাসপোর্ট যোগাড় করার চেয়ে দেশলাই কেনা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল—শিখধর্মের 'সিগরেট নিষেধ' তিনি মানতেন।

ফ্রাউ রুবেন্স বললেন, 'ভেরার জন্য পাসপোর্ট যোগাড় করা তাঁর পক্ষেও কঠিন, হয়তো অসম্ভব হত। কিন্তু একথাও জানি যে শেষ পর্যন্ত তিনি একটা পথ বের করতেনই করতেন।'

এ বিষয়ে আমার মনেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

ফ্রাউ রুবেন্স অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করতে আপনার কোনো আপত্তি আছে কি?'

ধর্মত বলছি, আমি ভাবলুম ফ্রাউ রুবেন্স রসিকতা করছেন। সব দেশেরই আপন আপন বিদঘুটে রসিকতা থাকে, তাই এক ভাষার রসিকতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। হয়ত জর্মন রসিকতাটির ঠিক রস ধরতে পারিনি ভেবে ক্যাবলার মতো আমি তখন একটুখানি 'হে-হে' করেছিলুম।

ফ্রাউ রুবেন্স আমার কাষ্ঠরসময় 'হে-হে'তে বিচলিত না হয়ে বললেন, 'নিতান্ত দলিল-সংক্রান্ত বিয়ে। আপনি যদি ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করেন তবে তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতীয় অর্থাৎ ব্রিটিশ নেশনালিটি পেয়ে যাবেন এবং অনায়াসে প্যারিস যেতে পারবেন। মাসতিনেক পর আপনি ভেরার বিরুদ্ধে ডেজারশনের (পতিবর্জনের) মোকদ্দমা এনে ডিভোর্স (তালাক) পেয়ে যাবেন।' তারপর একটু কেশে বললেন, 'আপনাকে স্বামীর কোনো কর্তব্যই সমাধা করতে হবে না।' একটুখানি থেমে বললেন, 'খাওয়ানো পরানো, কিছুই না।'

লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে গিয়েছিল, না ভয়ে আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, না আশ্চর্য হয়ে আমার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল আজ এতদিন বাদে বলতে পারব না। এমনকি ক্যাবলাকান্তের মতো 'হে-হে' করাও তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

রায়ের বিয়ার ফুরিয়ে গিয়েছে বলে কথা বলার ফুর্সৎ পেলেন। বললেন, 'বিলক্ষণ! আমারও সেই অবস্থা হয়েছে।'

চাচা বললেন, 'ছাই হয়েছে, হাতি হয়েছে। আমার বিপদের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। সব কথা পয়লা শুনে নাও, তারপর যা খুশি বলো।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফ্রাউ রুবেন্‌স যা বললেন তার থেকে বুঝতে পারলুম যে তিনি ভাত ঠাণ্ডা হতে দেন না, তার উপরই গরম ঘি ছাড়েন। বললেন, 'আমার দৃঢ় প্রত্যয়, হিম্মৎ সিংকে এ পথটা দেখিয়ে দিতে হত না। তিনি দু'মিনিটের ভিতর সব কিছু ফিক্‌স উন্ড ফের্তিস (পাকাপোক্ত) করে দিতেন।'

চাচা বললেন, 'ইয়োরোপে cold-blooded খুন হয়, ভারতবর্ষে কোল্ড-ব্লাডেড বিয়ে হয়। এবং দুটোই ভেবে চিন্তে, প্ল্যানমাফিক, প্রিমেডিটেটেড। কিন্তু এখানে আমাকে অনুরোধ করা হচ্ছিল কোল্ড-ব্লাডেড বিয়ে করতে, কিন্তু না ভেবে-চিন্তে, অর্থাৎ রোমান্টিক কায়দায়। প্রথম দর্শনে প্রেম হয় শুনেছি, কিন্তু প্রথম দর্শনেই বিয়ে, এরকমধারা ব্যাপার আমি ইয়োরোপে দেখিওনি, শুনিওনি। অবশ্য আমার এ সব তাবৎ ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বলির পাঁঠা আমি হতে যাব কেন?

অপরূপ সুন্দরী। দেখে চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছিল অস্বীকার করব না, কিন্তু বিয়ে—!

ফ্রাউ রুবেন্‌স গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?'

আমি চুপ।

তখন ফ্রাউ রুবেন্‌স এমন একখানা অস্ত্র ছাড়লেন যাতে আমার আর কোনো পথ খোলা রইল না। বললেন, 'আপনি কি সত্যি হিম্মৎ সিংকে ভালোবাসতেন?'

চাচা বললেন, 'অন্য যে-কোনো অবস্থায় হলে আমি ফ্রাউ রুবেন্‌সকে একটা ঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করতুম, কিন্তু তখন কোনো উত্তরই দিতে পারলুম না। তোরা জানিস আমি স্নেহ-প্রেম-দয়ামায়াকে বুদ্ধিবৃত্তি-আত্মজয়ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি দাম দিই। কাজেই ফ্রাউ রুবেন্‌সের আঘাতটা আমার কতখানি বেজেছিল তার খানিকটে অনুমান তোরা করতে পারবি। কোনো চোখা উত্তর যে দিইনি তার কারণ, ততখানি চোখা জর্মন আমি তখন জানতুম না।

ঘড়েল মাস্টারগুলো জানে যে ছাত্র যখন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, তখন তাকে ভালো করে নির্যাতন করার উপায় হচ্ছে চুপ করে উত্তরের প্রতীক্ষা করা। ফ্রাউ রুবেন্‌স সেটা চরমে পৌঁছিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি তা হলে হিম্মৎ সিংয়ের ঋণ শোধ করতে চান না?'

রায়ের বিয়ার এসে গিয়েছে। চুমুক দিয়ে বললেন, 'চাচা, মাপ করুন। আপনার কেস অনেক বেশি মারাত্মক।'

চাচা রায়ের কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'সেই বে-ইজ্জতিরও যখন আমি কোনো উত্তর দিলুম না তখন ফ্রলাইন গিব্রিয়াডফ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কুণ্ডলী-পাকানো গোখরো সাপকে আমি এরকমধারা হঠাৎ খাড়া হতে দেখেছি। গিব্রিয়াডফের মুখ লাল, কালো চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, সে আগুনের আঁচ ব্লন্ড চুলে

লেগে চুলও যেন লাল হয়ে গিয়েছে।'

ফ্রাউ রুবেন্‌স তাঁকে বললেন, 'আপনি শান্ত হোন। বারন ফন্ ফাক্রেনডর্ফ যখন আপনাকে বিয়ে করার জন্য পায়ের তলায় বসেন, তখন এর প্রত্যাখ্যানে অপমান বোধ করছেন কেন?'

ভেরা বসে পড়লেন।

আমি তখন দিগ্বিদিকশূন্য। অতিকষ্টে বললুম, 'আমাকে দুদিন সময় দিন।'

ফ্রাউ রুবেন্‌স কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ভেরা বাধা দিয়ে বললেন, 'সেই ভালো।' দু'জনাই উঠে দাঁড়ালেন। ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'পরশুদিন পাঁচটায় তাহলে এখানে আবার দেখা হবে।'

হ্যান্ডশেক না করেই দুজনা বেরিয়ে গেলেন। ফ্রাউ রুবেন্‌স কাঁচা রেল লাইনের উপর বিরাট এঞ্জিনের মতো হেলেদুলে গেলেন, আর ভেরার চেয়ার ছেড়ে ওঠা আর চলে যাওয়ার ধরন দেখে মনে হল, যেন টব ছেড়ে রজনীগন্ধাটি হঠাৎ দুখানা পা বের করে ঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। সর্বাঙ্গে হিল্লোল, কিন্তু মাথাটি স্থির, নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মতো। যেন রাজপুত মেয়ে কলসী-মাথায় চলে গেল। ক্যোনিক কাফের আন্তর্জাতিক খদ্দের-গোষ্ঠী সে-চলন মুগ্ধ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখল।'

লেডি-কিলার সরকার বলল, 'মাইরি চাচা, আপনার সৌন্দর্যবোধ আর কবিত্বশক্তি দুইই আছে। অমনতরো বিপাকের মধ্যিখানে আপনি সবকিছু লক্ষ্য করলেন!'

চাচা বললেন, 'কবিত্বশক্তি না ষাঁড়ের গোবর! আমি লক্ষ্য করেছিলুম জ্বরের ঘোরে মানুষ যে রকম শেতলপাটির ফুলের পেটার্ন মুখস্থ করে, সেই রকম।

তারপরে দুদিন আমার কী করে কেটেছিল সে-কথা আর বুঝিয়ে বলতে পারব না! একরকম হাবা হয় দেখেছিস, মুখে যা দেওয়া গেল তাই পড়ে পড়ে চিবোয় আর চিবোয়—বলে দিলেও গিলতে পারে না। আমি ঠিক তেমনি দুদিন ধরে একটি কথার দুটো দিক মনে মনে কত লক্ষবার যে চিবিয়েছিলুম বলতে পারব না। হিম্মৎ সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার একমাত্র পন্থা যদি ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করাই হয় তবে আমি সে কর্তব্য এড়াই কী করে—আর চেনা নেই, পরিচয় নেই, একটা মেয়েকে হুশ করে বিয়ে করিই বা কী প্রকারে? সমস্যাটা চিবুচ্ছি আর চিবুচ্ছি, গিলে ফেলে ভালো-মন্দ যাই হোক, একটা সমাধান যে করব, সে ক্ষমতা যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলুম।

মুরুব্বি নেই, বন্ধু নেই, সলা-পরামর্শ করিই বা কার সঙ্গে? হিম্মৎ সিং যাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মাবার কথা নয়, নিজের থেকেও কোনো বন্ধু জোটাতে পারিনি কারণ আমার জর্মন তখনো গল্প জমাবার মতো মিশ্রির দানা বাঁধেনি। যাই কোথায়, করি কী?

যুনিভার্সিটির কাছে একটা দুধের দোকানে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি—আমার মেয়াদের তখন আর মাত্র চব্বিশ ঘন্টা বাকি—এমন সময় জুতোর শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি, সামনে ফ্রলাইন ক্লারা ফন্ ব্রাখেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রের ছাত্রী, বার্লিনের মেয়েদের হকি টিমের কাপ্তান। ছ'ফুটের মত লম্বা, হঠাৎ রাস্তায় দেখলে মনে হতো মাইকেলএঞ্জেলোর মার্বেল মূর্তি স্কার্ট-ব্লাউজ পরে বেড়াতে বেরিয়েছে। আমার সঙ্গে সামান্য আলাপ ছিল।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে আপনার?'

মাথা নাড়িয়ে জানালুম কিচ্ছু হয়নি।

ধমক দিয়ে বললেন, 'আলবৎ হয়েছে! খুলে বলুন।'

বয়সে আমার চেয়ে ছয় বছরের বড় হয় কি না হয়, কথার রকম দেখে মনে হয় যেন জ্যাঠাইমা। বললুম, 'বলছি, কিছুই হয়নি।'

ফন্ ব্রাখেল আমার পাশে বসলেন। আমার কোটের আস্তিনে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বলুনই না কী হয়েছে।'

তখন চেখফের একটা গল্প মনে পড়ল। এক বুড়ো গাড়োয়ান তার ছেলে মরে যাওয়ার দুঃখের কাহিনী কাউকে বলতে না পেয়ে শেষটায় নিজের ঘোড়াকে বলেছিল। ঘোড়ার সঙ্গে ফন্ ব্রাখেলের অন্তত একটা মিল ছিল। হকিতে তাঁর ছুট যেমন-তেমন ঘোড়ার চেয়ে কম ছিল না। আমি তখন মরিয়া। ভাবলুম, দুগগা বলে ঝুলে পড়ি।

সমস্ত কাহিনী শুনে ফন্ ব্রাখেল পাঁচটি মিনিট ধরে ঠা-ঠা করে হাসলেন। হাসির ফাঁকে ফাঁকে কখনো বলেন, 'ডু লীবার হের গট্ (হে মা কালী), কখনো বলেন, 'ভী ক্যোস্ট্‌লিষ্' (কী মজার ব্যাপার), কখনো বলেন, 'লাখেন ডি গ্যোটার্' (দেবতারা শুনলে হাসবেন)।

আমি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। ফন্ ব্রাখেল আমার কাঁধে দিলেন এক গুঁত্তা। ঝপ করে ফের বসে পড়লুম। বললেন, 'ডু ক্লাইনার ইডিয়োট্ (হাবাগঙ্গারাম), এখখুনি তোমার ফোন করে বলে দেওয়া উচিত, তোমার দ্বারা ওসব হবে-টবে না।'

আমি বললুম, 'হিম্মৎ সিং থাকলে যা করতেন, আমার তাই করা উচিত।'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'ঈসপের গল্প পড়নি? ব্যাঙ ফুলে ফুলে হাতি হবার চেষ্টা করেছিল। হিম্মৎ সিংয়ের পক্ষে যা সরল, তোমার পক্ষে তা অসম্ভব। তাঁকে আমি বেশ ভালো করেই চিনি—হকি খেলায় তিনি আমাদের তালিম দিতেন। তাঁর দাড়ি-গোঁফ নিয়ে তিনি পঁচিশখানা বিয়ে করতে পারতেন, দুটো হারেম পুষতে পারতেন। পারো তুমি?'

আমি বললুম, 'গিব্রিয়াডফ বড় বিপদে পড়েছেন। আমার তো কর্তব্যজ্ঞান আছে!'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'যে মেয়ে মস্কো থেকে পালিয়ে বার্লিন আসতে পারে, তার

পক্ষে বার্লিন থেকে প্যারিস যাওয়া ছেলেখেলা। রুশ সীমান্তের পুলিশের হাতে থাকে মেশিনগান, জর্মন সীমান্তের পুলিশের হাতে রবরের ডাণ্ডা।'

আমি যতই যুক্তিতর্ক উত্থাপন করি তিনি ততই হাসেন, আর এমন চোখা-চোখা উত্তর দেন যে আমার তাতে রাগ চড়ে যায়। শেষটায় বললুম, 'আপনি পুরুষ হলে বুঝতে পারতেন, যুক্তিতর্কের উপরেও পুরুষের কর্তব্যজ্ঞান নামক ধর্মবুদ্ধি থাকে।'

ফন্ ব্রাখেল গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যে পুরুষ তাতে আর কী সন্দেহ! সোজা বলে ফেল না কেন সুন্দরী দেখে সেই পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছে।'

আমি আর ধৈর্যধারণ করতে পারলুম না। বেরবার সময় শুনতে পেলুম ফন্ ব্রাখেল বলছেন 'বিয়ের কেক-শ্যাম্পেন অর্ডার দিয়ো না কিন্তু! বিয়ে হবে না।'

একেই তো আমার দুর্ভাবনার কূলকিনারা ছিল না, তার উপর ফন্ ব্রাখেলের ব্যঙ্গ। মনটা একেবারে তেতো হয়ে গেল। শরৎ চাটুয্যের নায়করাই শুধু যত্রতত্র 'দিদি' পেয়ে যায়, আমার কপালে ঢুঢু।

সোজা বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লুম। অন্ধকারে শিস দিয়ে মানুষ যেরকম ভূতের ভয় কাটায় আমি তেমনি হিম্মৎ সিংয়ের প্রিয় দোহাটি আবৃত্তি করতে লাগলুম:

'এহ্সান নাখুদাকা উঠায় মেরী বলা
কিস্তি খুদা পর ছোড় দুঁ লঙ্গরকো তোড় দুঁ।'

'মাঝি আমায় সব বিপদ-আপদ থেকে বাঁচাবে এই আমার ভরসা?
নৌকো খুদার নামে ভাসালুম, নোঙর ভেঙে ফেলে দিয়েছি।'

পরদিন পাঁচটার সময় কাফে ক্যোনিকে গিয়ে বসলুম। জানা ছিল, ফাঁসির পূর্বে খুনীকে সাহস দেবার জন্য মদ খাইয়ে দেওয়া হয়। হিম্মৎ সিং আমাকে কখনো মদ খেতে দেননি। ভাবলুম, তাঁর ফাঁসিতে যখন চড়ছি তখন খেতে আর আপত্তি কী?'

গোলাম মৌলা অবাক হয়ে শুধাল, 'মদ খেলেন?'

চাচা বললেন, 'কেনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাওয়া হয়নি।

সোয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, ছ'টা বাজল। ফ্রাউ রুবেন্স, ফ্রলাইন গিব্রিয়াডফ কারো দেখা নেই। এর অর্থ কী? জর্মনরা তো কখনো এরকম লেট হয় না। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। যাই হয়ে থাকুক না কেন, আমি পালাই।

বাড়ি ফিরে ভয়ে ভয়ে ল্যান্ডলেডিকে জিজ্ঞেস করলুম, ফ্রাউ রুবেন্স ফোন করেছিলেন কি? না। আমার উচিৎ তখন ফোন করা। অনুসন্ধান করা, কোনো দুর্ঘটনা

ঘটেনি তো? কিন্তু চেপে গেলুম। নোঙর যখন ভেঙে ফেলে দিয়েছি তখন আমি হালই বা ধরতে যাব কেন?

সাতদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিলুম। রাত্রে শুতে যাবার সময় একবার ল্যান্ডলেডিকে চিঁচিঁ করে জিজ্ঞেস করতুম, কোনো ফোন ছিল কি না। ল্যান্ডলেডি নিশ্চয় ভেবেছিল আমি কারো প্রেমে পড়েছি। প্রেমের দ্বিতীয় অঙ্কে নাকি মানুষ এরকম করে থাকে।

কোনো ফোনও না।

করে করে তিন মাস কেটে গেল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কাজকর্মে মন দিলুম।'

নটেগাছটি মুড়িয়ে দিয়ে চাচা চেয়ারে হেলান দিলেন।

ভোজের শেষে সন্দেশ-মিষ্টি না দিলে বরযাত্রীদের যে রকম হন্যে হয়ে ওঠার কথা, আমরা ঠিক সেইরকম একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম। মুখুয্যে বলল, 'কিন্তু ওনারা সব এলেন না কেন, তার তো কোনো হদিশ পাওয়া গেল না।'

সরকার বলল, 'আপনার শেষরক্ষা হল বটে, কিন্তু গল্পটির শেষরক্ষা হল না।'

রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, 'নোঙর-ভাঙা নৌকোতে আমাকে ফেলে আপনি কেটে পড়লেন চাচা? আমার উদ্ধারের উপায় বলুন।'

চাচা বললেন, 'মাসতিনেক পরে দস্তানা কিনতে গিয়েছি 'তীৎসে'। জর্মনদের হাতের তুলনায় আমাদের হাত ছোট বলে লেডিজ ডিপার্টমেন্টে আমাদের দস্তানা কিনতে হয়। সেখানে ফন্ ব্রাখেলের সঙ্গে দেখা। কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হে পুরুষ-পুঙ্গব, এখানে কেন? নিজের জন্য দস্তানা কিনছ, না বউয়ের জন্য? কিন্তু বউ কোথায়?' আমি উষ্মাভরে গটগট করে চলে যাচ্ছিলুম, ফন্ ব্রাখেল আমার হাতটি চেপে ধরলেন— 'বুলি'র সময় হকিস্টিক যেরকম চেপে ধরেন।

সেই কাফে ক্যোনিকেই নিয়ে বসালেন।

বললেন, 'আমি সেদিন পাঁচটার সময় কাফের উপরের গ্যালারিতে বসে তোমাকে লক্ষ্য করছিলুম।'

আমি তো অবাক।

বললেন, 'ওরা কেউ এল না বলে তোমার সঙ্গে কথা না বলে চলে গেলুম। কিন্তু তারা এল না কেন জান? তবে শোনো। তোমার মতো মূর্খকে বাঁচানো আমার কর্তব্য মনে করে আমি তাদের সঙ্গে লড়েছিলুম। হিম্মৎ সিং আমার বন্ধু, আমার পিতারও বন্ধু। তাঁর প্রতি এবং তাঁর 'প্রতেজে' তোমার প্রতি আমারও কর্তব্য আছে।

তোমার কাছ থেকে সব কথা শুনে আমি সোজা চলে যাই ফ্রাউ রুবেন্সের ওখানে। তাঁকে রাজি করাই আমাকে গিব্রিয়াডফের ওখানে নিয়ে যাবার জন্য। সময় অল্প ছিল

বলে, এবং ইচ্ছে করেই, ফোন করে যাইনি। গিয়ে দেখি সেখানে একপাল ষাঁড়ের সঙ্গে সুন্দরী শ্যাম্পেন খাচ্ছেন, হৈহল্লা চলছে। ফ্রাউ রুবেন্‌সের চক্ষুস্থির। তিনি গিব্রিয়াডফ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য ধারণা করেছিলেন—ইংরেজিতে যাকে বলে ডেমজেল্ ইন্ ডিস্‌ট্রেস্ (বিপন্না)। সে কথা থাক—আমি দু'জনকে সামনে বসিয়ে পষ্টাপষ্টি বললুম যে তোমাতে-আমাতে প্রেম, বিয়ে স্থির—আমি অন্য কোনো মেয়ের নোন্‌সেন্স সহ্য করব না।'

আমি বললুম, 'এ কী পাগলামি! আপনি এসব মিথ্যেকথা বলতে গেলেন কেন?'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'চুপ করে শোনো। আমি বাজে বকা পছন্দ করিনে। এছাড়া অন্য উপায় ছিল না। গিব্রিয়াডফ কিন্তু কামড় ছাড়ে না—আমি তখন ভয় দেখিয়ে বললুম যে, আমি পুলিশে খবর দেব তার পাসপোর্ট নেই, আর পাসপোর্ট যোগাড়ের জন্য তোমাকে মেকি বিয়ে করছে। আমি অবশ্য সমস্তক্ষণ ভান করছিলুম যে আমি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি—তোমার মতো অজমূর্খের প্রেমে হাবুডুবু, শুনলে মুরগিগুলো পর্যন্ত হেসে উঠবে!—আর তোমাকে বিয়ে করার জন্য এমনি হন্যে হয়ে আছি যে, পুলিশ লেলানো, খুনখারাবী সব কিছুই করতে প্রস্তুত।

গিব্রিয়াডফ হার মানলেন। ফ্রাউ রুবেন্‌স ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। গিব্রিয়াডফ যে তাঁকে কতদূর বোকা বানিয়েছে বুঝতে পেরে বড় লজ্জা পেলেন। বাড়ি ফেরার পথে গিব্রিয়াডফ তাঁর সঙ্গে কী করে বন্ধুত্ব জমিয়েছিল সে ব্যাপার আগাগোড়া খুলে বললেন। তখন আরো অনুসন্ধান করে জানলুম, মস্কোতে এ গিব্রিয়াডফের বাড়িতে হিম্মৎ সিং কখনো বসবাস করেননি—এরা ওঁদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় মাত্র।'

চাচা বললেন, 'ফন্ ব্রাখেল উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমার তাড়া আছে, হকি ম্যাচে চললুম।''

আমি বললুম, 'কিন্তু একটা কথার উত্তর দিন। গিব্রিয়াডফ বিয়ের জন্য আমাকেই বাছলেন কেন? বারন ফন্ ফাক্রেনডর্ফের মতো বর তো ছিল।'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'লীবার ইডিয়োট্ (প্রিয় মূর্খ), গিব্রিয়াডফ তো বর খুঁজছিল না, খুঁজছিল শিখণ্ডী। ফাক্রেনডর্ফ বা অন্য কাউকে বিয়ে করলে সে স্বামী তার হক্ক চাইত না? তা হলে পঁচিশটে ষাঁড়ের সঙ্গে দিবারাত্তির শ্যাম্পেন চলত কী করে? ফাক্রেনডর্ফ প্রাশান মোষ, নীটশের উপদেশে বিশ্বাস করে—স্ত্রীলোকের কাছে যেতে হলে চাবুকটি নিয়ে যেতে ভুলো না।—হল? বুঝলে হে নরার্ষভ?'

চাচা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'জীবনে এরকম বোকা বনিনি, অপমানিত বোধ করিনি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা গিলে ফেলা ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না।'

গোলাম মৌলা বলল, 'একটা বাজতে তিন মিনিট। শেষ ট্রেন একটা দশে।'

আমরা হন্তদন্ত হয়ে ছুট দিলুম সাভিন্নিপ্লাৎস্ স্টেশনের দিকে। রায় চেঁচিয়ে বললেন,

'চাচা, ফন্ ব্রাখেলের ঠিকানা কী?'

চাচাও তখন তাঁর গলাবন্ধ কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে ছুট দিয়েছেন। বললেন, 'সে বিয়ারে ছাই। তোমার ফিয়াঁসে শ্রীমতী জমিতফের সঙ্গে ফন্ ব্রাখেলের গলাগলি। তাই তো বলেছিলুম, বড় ভাবিয়ে তুলেছ!'

কর্নেল

কুরফুর্স্টেন্‌ডাম্‌ বার্লিন শহরের বুকের উপরকার যজ্ঞোপবীত বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ওরকম নৈকষ্য-কুলীন রাস্তা বার্লিনে কেন, ইয়োরোপেই কম পাওয়া যায়। চাচার মেহেরবানিতে 'হিন্দুস্থান হৌস' যখন গুলজার, তখন কিন্তু বার্লিনের বড় দুরবস্থা। ১৯১৪-১৮-এর শ্মশান-ফেরতা বার্লিন ১৯২৯-এও পৈতে উল্টো কাঁধে পরছে, এবং তাই গরীব ভারতীয়দের পক্ষেও সম্ভবপর হয়েছিল কুরফুর্স্টেন্‌ডামের গা ঘেঁষে উলান্ডস্ট্রাসের উপর আপন রেস্তোরাঁ 'হিন্দুস্থান হৌস' পত্তন করার।

বহু জর্মন-অজর্মন 'হিন্দুস্থান হৌসে' আসত। জর্মনরা আসত নূতনত্বের সন্ধানে— কলকাতার লোক যে রকম 'চাইনীজ' বা 'আমজদিয়ায়' খেতে যায়। ভারতীয়েরা নিয়ে আসত জর্মন-অজর্মন বান্ধবীদের—মাছ-ভাত বা ডাল-রুটির স্বাদ বাৎলাবার জন্য, আর বুলগেরিয়ান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জর্মনদের সঙ্গে নিয়ে, তাদের কাছে সপ্রমাণ করার জন্য যে তাদের আপন আপন দেশের রান্না ভারতীয় রান্নার চেয়ে ভালো। কিন্তু ভারতীয় রান্না এমনি উচ্চশ্রেণীর সত্তা যে তার সঙ্গে শুধু ভগবানের তুলনা করা যেতে পারে। ভগবানের অস্তিত্ব যে রকম প্রমাণ করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, ভারতীয় রান্নাও জর্মনদের কাছে ঠিক তেমনিতর প্রমাণ বা বাতিল কিছুই করা যায় না। কারণ ভারতীয় রান্নার বর্ণনাতে আছে:

তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে।

এবং সে গ্রাম্ভারী রান্না কেন, মামুলী রান্নায় সামান্যতম মশলা দিলেও জর্মনরা সে-খাদ্য গলাধঃকরণ করতে পারে না। আর মশলা না দিলে আমাদের ঝোল হয়ে যায় আইরিশ স্টু, ডাল হয় লেন্টিল সুপ, তরকারি হয় বয়েল্ড ভেজ্‌, মাছভাজা হয় ফ্রাইড্‌ ফিশ্‌। আমাদের চতুর্বর্ণ তখন শুধু বর্ণ নয়, রস-গন্ধ-স্বাদ সব কিছু হারিয়ে একই বিস্বাদের আসনে বসেন বলে চণ্ডালের মতো হয়ে যান। কাজেই আমাদের রান্না জর্মনদের কাছে

এখনো ভগবানেরই ন্যায় সিদ্ধাসিদ্ধ কিছু নন। দাবাখেলায় এই অবস্থাকেই বলে চালমাত।

তবে হাঁ, আমাদের ছানার সন্দেশ ছিল কান্টের কাটেগরিশে ইম্পেরাটিফের মতো অলঙ্ঘ্য ধর্ম। তার সামনে জর্মন-অজর্মন সকলেই মাথা নিচু করতেন। ছানা-তত্ত্বে অবাঙালির অবদান অনায়াসে অবহেলা করা যেতে পারে।

'হিন্দুস্থান হৌসে'র সবচেয়ে বড় আড়কাঠি ছিলেন চাচা। হিন্ডেনবুর্গের গোঁপের পরেই বার্লিনের সবচেয়ে পরিচিত বস্তু ছিল চাচার বেশ—তার সঙ্গে 'ভূষা' শব্দ জুড়লে চাচার প্রতি অন্যায় করা হবে। সে বেশ ছিল সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত।

কারখানার চোঙার মতো গোলগাল পাতলুন, গলা-বন্ধ হাঁটু-জোকা কোট আর ভারি-ভারি এক জোড়া মিলিটারি বুট। লোকে সন্দেহ করত, তাঁর কোটের তলায় কামিজ-কুর্তা নাকি নেই। তবে এ-কথা ঠিক কোট, পাতলুন, বুট ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় আবরণ বা আভরণ তাঁর শ্যামাঙ্গে কেউ কখনো বিরাজ করতে দেখেনি। বার্লিনের মতো পাথর-ফাটা শীতেও তিনি কখনো হ্যাট, টুপি, ওভারকোট বা দস্তানা পরেননি। খুব সম্ভব শীতের প্রকোপেই তাঁর মাথার ঘন বাবরী চুল পাতলা হয়ে আসছিল, কিন্তু চাচা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

সেই অপরূপ পাতলুন, গণ্ডারের চামড়ার মতো পুরু গলাবন্ধ কোট, আর একমাথা বাবরী নিয়ে চাচা হঠাৎ থমকে দাঁড়াতেন কুরফুর্স্টেন্ডামের ফুটপাতে। পেছনের দিকে মাথা ঠেলে, উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন উড়ন্ত মেঘের পানে। কেন, কে জানে? হয়তো বিদেশের অচেনা-অজানা দালান-কোঠা রাস্তাঘাটের মাঝখানে একমাত্র আকাশ আর মেঘই তাঁকে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। দেশ ছেড়েছেন বহুকাল হল, কবে ফিরবেন জিজ্ঞাসা করলে হাঁ-না কিছু কবুল না করে কলকাতার উড়িষ্যাবাসীদের মতো শুধু বলতেন 'ললাটঙ্ক লিখন!'

বার্লিনের লোক শহরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে কাব্যি করে না। দু'মিনিট যেতে না যেতেই চাচার চতুর্দিকে ভিড় জমে যেত। তাঁর অদ্ভুত বেশ, বাবরী চুল, ঘনশ্যাম দেহরুচি আর বেপরোয়া ভাব লক্ষ্য না করে থাকবার যো ছিল না।

ফিসফিস শুনেই চাচার ঘুম ভাঙত। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে 'বাও' করে একটু মৃদু হাসির মেহেরবানি দেখাতেন। ভিড় তখন ফাঁক হয়ে রাস্তা করে দিত। চাচা আবার 'বাও' করে 'হিন্দুস্থান হৌস' রওয়ানা দিতেন। কেউ 'গুটেন মর্গেন' (সুপ্রভাত) ধবনের কিছু বললে বা পরিচয় করবার চেষ্টা দেখালে চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতর হাত চালিয়ে তাঁর একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে এগিয়ে ধরে ফের 'বাও' করতেন—যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী নবাব কাউকে ডুয়েলে আহ্বান করছেন। সে-কার্ডে চাচার ঠিকানা থাকত হিন্দুস্থান হৌসে'র। জর্মনরা চালাক। বুঝত, চাচা রাস্তার মাঝখানে নীরব কাব্য করেন

বলে কথা বলতে চান না। কাজেই তারা চাচার আড্ডায় এসে উপস্থিত হতো।

মেঘ দেখবার জন্য অন্য জায়গা এবং অন্য কায়দা থাকতে পারে, কিন্তু 'হিন্দুস্থান হৌসে'র রান্নার খুশবাই ছড়াবার জন্য এর চেয়ে ভালো গ্যোবেল্‌স্‌ আর কী হতে পারে?

শ্রীধর মুখুয্যে বলছিল, 'সংস্কৃতের নতুন ছোকরা প্রফেসর এসেছে য়ুনিভার্সিটিতে। পড়াচ্ছে গীতা। আজ সকালে প্রথম অধ্যায় পড়াবার সময় বলল, 'কুলক্ষয়-ফুলক্ষয় সব আবোল-তাবোল কথা। বর্ণসঙ্কর না হলে কোনো জাতের উন্নতি হয় না।' তার থেকে আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে গীতার প্রথম অধ্যায়টা গুপ্তযুগে লেখা। বর্ণসঙ্করের জুজু নাকি বৌদ্ধযুগের পূর্বে ছিল না।'

চাচা বললেন, 'কী করে বর্ণসঙ্কর হয়, আর তার ফল কী, সেটা প্রথম অধ্যায়ে বেশ ধাপে ধাপে বাৎলানো হয়েছে, না রে? বলতো, ধাপগুলো কী?'

শ্রীধর খাবি খাচ্ছে দেখে আড্ডার পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলল, 'কুলক্ষয় থেকে কুলধর্মনষ্ট, কুলধর্মনষ্ট থেকে অধর্ম, অধর্ম থেকে স্ত্রীলোকদের ভিতর নষ্টামি, নষ্টামি থেকে বর্ণসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর হলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ—'

মুখুয্যে বাধা দিয়ে বলল, 'হাঁ, হাঁ, প্রফেসর বলছিল, ''পিণ্ডির পরোয়া করে কোন সুস্থবুদ্ধির লোক'' ?'

বিয়ারের ভিতর থেকে সূয্যি রায়ের গলা বুদ্বুদের মতো বেরলো, 'ছোকরা প্রফেসর ঠিক বলেছে। বর্ণসঙ্কর ভালো জিনিস। মুখুয্যে বামুনের ছেলে, এদিকে গীতার পয়লা পাঠ মুখস্থ নেই। সরকার কায়েতের ছেলে, পুরো চেনটা বাৎলে দিলে। মুখুয্যের উচিত সরকারের মেয়েকে বিয়ে করে কুলধর্ম বাঁচানো।'

চাচা বললেন, 'ঠিক বলেছ, রায়। তাহলে তুমি এক কাজ কর। তোমার বিয়ারে একটু জল মিশিয়ে ওটাকে বর্ণসঙ্কর করে ফেলো।'

রায় রীতিমতো শকড হয়ে বললেন, 'পানশাস্ত্রে এর চেয়ে বড় নাস্তিকতা আর কিছুই হতে পারে না। বিয়ারে জল!'

চাচা মুখুয্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোদের নয়া প্রফেসরটা নিশ্চয়ই ইহুদি। ওরা যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করে আপন জাতটাকে খাঁটি রাখবার জন্য, ঠিক তেমনি আর পাঁচজনকে উপদেশ দেয় বর্ণসঙ্কর ডেকে আনবার জন্য। ওদিকে খাঁটি জর্মন এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না একদম, কিন্তু কাজের বেলায় না খেয়ে মরবে তবু বর্ণসঙ্কর হতে দেবে না।'

সরকার জিজ্ঞেস করল, 'এদেশেও নিরম্বু-উপবাস আছে নাকি?'

চাচা বললেন, 'আলবাৎ! শোন। আমি এ-বিষয়ে ওকীবহাল।

'পয়লা বিশ্বযুদ্ধের পর হেথায় অবস্থা হয়েছিল 'জর্মনির সর্বনাশ, বিদেশীর পৌষ

মাস।' ইনফ্লেশনের গ্যাসে ভর্তি জর্মন কারেন্সির বেলুন তখন বেহেশতে গিয়ে পৌঁচেছে—বেহেশতটা অবশ্যি বিদেশীদের জন্য, জর্মনরা কেউ পাঁচ হাজার, কেউ দশ হাজারে বেলুন থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে। আত্মহত্যার খবর তখন আর কোনো কাগজ ছাপাত না, নারী-হৃদয় ইকনমিক্সের কমডিটি, এক 'বার' চকলেট দিয়ে একসার ব্লন্ড কেনা যেত, পাঁচটাকায় 'ফার' কোট, পাঁচশ' টাকায় কুর্‌ফুর্স্টেন্‌ডামে বাড়ি, এক টাকায় গ্যেটের কমপ্লীট ওয়ার্কস।'

আড্ডার সবাই সেই সর্বনাশী পৌষ মাসের কথা ভেবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

চাচা বললেন, 'সেই ঝড়ে তখনো যে সব বাড়ি দড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল তাদের প্রত্যেকের ভিতরে ছিল বিদেশী পেয়িং-গেস্ট। যেসব জর্মন পরিবারে বিদেশীরা পেয়িং-গেস্ট হয়ে বসবাস করছিল তাদের প্রায় সকলেই খেয়েপরে জান বাঁচাতে পেরেছিল, কারণ যত নির্লজ্জ, কঞ্জুস, সুবিধাবাদী, পৌষ-মাসীই হও না কেন, তামাম মাসের ঘরভাড়া, খাইখর্চার জন্য অন্তত পঞ্চাশটি টাকা তো দিতে হয়। বিদেশী টাকার তখন এমনি গরমী যে সেই পঞ্চাশ টাকায় তোমাকে নিয়ে একটা পরিবারের কায়ক্লেশে দিনগুজরান হয়ে যেত।'

গোঁসাই গুনগুন করে গান ধরলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, তোমার সেই নতুন বয়সের কালে।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু একটা দেশের দুর্দিনে এক সের ধান দিয়ে পাঁচ সের চাল নিতে আমার বাধত। তাই যখন আমার বুড়ো ল্যান্ডলেডি একদিন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল তখন আমাকে লুফে নেবার জন্য পাড়ায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এমন সময় আমার বাড়িতে একদিন এসে হাজির ফ্রলাইন ক্লারা ফন্‌ ব্রাখেল।'

আড্ডা একগলায় শুধাল, 'হকি-টিমের কাপ্তান?'

চাচা বললেন, 'আমার জান-বাঁচানেওয়ালী। বললেন, 'ক্লাইনার ইডিয়োট্‌ (হাবাগঙ্গারাম), তুমি যদি অন্যত্র কোথাও না গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠো তা হলে আমি বড় খুশি হই। প্রাশান ওবের্স্টের (কর্নেলের) বাড়ি, একটু সাবধানে চলতে হবে। এককালে খুব বড়লোক ছিলেন, এখন 'উন্‌জর্‌ টেগ্‌লিষেস্‌ ব্রোট্‌ গিব্‌ উন্‌স্‌ হয়টে (Give us this day our daily bread)। অথচ এমন দম্ভী যে পেয়িং-গেস্টের কথা তোলাতে আমাকে কোর্ট-মার্শাল করতে চান! শেষটায় যখন বললুম যে তুমি প্রাশান *কারো কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের জর্মন শেখার জন্য সুদূর ভারতবর্ষ থেকে বার্লিন এসেছ,* তখন ভদ্রলোক মোলায়েম হন। এখন বুঝতে পারছ, কেন তোমাকে সাবধানে পা ফেলতে বললুম। তুমি ভাবটা দেখাবে যেন তাঁর বাড়িতে উঠতে পেরে কৃতার্থম্মন্য হয়েছ। তুমি যে কোনো উপকার করছ সেটা যেন ধরতে না পারেন। তাঁর বউ সম্বন্ধে

কোনো দুর্ভাবনা কোরো না। তিনি সব বোঝেন, জানেন।''

চাচা বললেন, 'প্রাশান অফিসারদের আমি চিরকাল এড়িয়ে গিয়েছি। দূর থেকে ব্যাটাদের ধোপদুরস্ত ইস্ত্রি-করা স্টিফ ইউনিফর্ম আর স্টিফ ভাবসাব দেখে আমার সব সময় মনে হয়েছে এরা যেন হাসপাতালের এপ্রন-পরা সার্জেনদের দল। সার্জেনরা কাটে নির্বিকার চিত্তে রোগীর পেট, এরা কাটে পরমানন্দে ফ্রান্সের গলা।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু ফন্ ব্রাখেলের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তার দৌলতে আমি অনেক কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলুম। এবং মনে মনে ভাবলুম বেশির ভাগ ভারতীয়ই বসবাস করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে, দেখাই যাক না খানদানীরা থাকে কী কায়দায়।

ফন্ ব্রাখেল আমাকে নিয়ে যাননি। খবর দিয়ে আমি একাই একদিন সুটকেস নিয়ে কর্নেল ডুটেন্হফারের বাড়ি পৌঁছলুম।

ট্যাক্সিওলা যে বাড়ির সামনে দাঁড়াল তার চেহারা আগে দেখা থাকলে ফন্ ব্রাখেলের প্রস্তাবে আমি রাজি হতুম কি না সন্দেহ। বাড়ি তো নয়, সে এক রাজপ্রাসাদ। এ বাড়িতে তো অন্তত শ'খানেক লোকের থাকার কথা। কিন্তু তাকিয়ে দেখি দোতলার মাত্র দু-তিনখানা ঘরের জানলা খোলা, বাদবাকি যেন সিল মেরে আঁটা। সামনে প্রকাণ্ড লন। পেরিয়ে গিয়ে দরজার ঘন্টা বাজালুম। মিনিটতিনেক পরে যখন ভাবছি আবার ঘন্টা বাজাবো কি না তখন দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

গহরজান যখন পানের পিক গিলতেন তখন নাকি গলার চামড়ার ভিতর দিয়ে তার লাল রঙ দেখা যেত। যে-রমণীকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম তাঁর চামড়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুখচ্ছবি দেখে মনে হল তিনি যেন সকালবেলাকার শিশির দিয়ে গড়া। জর্মনিতে পান পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার মনে হল ইনি পান খেলে নিশ্চয়ই পিকের রঙ এঁর গলার চামড়ায় ছোপ লাগাবে। চুল যেন রেশমের সুতো, ঠোঁট দু'খানি যেন প্রজাপতির পাখা, ভুরু যেন উড়ে-যাওয়া পাখি, সবসুদ্ধ মিলিয়ে মনে সন্দেহ হয় ইনি দাঁড়িয়ে আছেন না হাওয়ায় ভাসছেন। প্রথম দিনেই যে এ-সবকিছু লক্ষ্য করেছিলুম তা নয়। কিন্তু আজ যখন পিছনপানে তাকাই তখন তাঁর ঐ চেহারাই মনে পড়ে।

ইংরিজিতে বোধহয় একেই বলে ডায়াফনাস। 'আস্বচ্ছ' বললে ঠিক মানে ধরা পড়ে না।

কতক্ষণ ধরে হাবার মতো তাকিয়েছিলুম জানিনে, হঠাৎ শুনলুম 'গুটেন মর্গেন (সুপ্রভাত), আপনার আগমন শুভ হোক। আমি ফ্রাউ (মিসেস) ডুটেন্হফার।'

ভাগ্যিস ভারি মালপত্র ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির হাতে আগেই সমঝে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে মাল নিয়ে আমি বিপদে পড়তুম। এ রকম অবস্থায় চাকর-দাসী কেউ না কেউ আসে। কিন্তু কেউ যখন এল না তখন বুঝতে পারলুম ডুটেন্হফারদের

দুরবস্থা কতটা চরমে পৌঁচেছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডজনখানেক হল পেরলুম—কোথাও একরত্তি ফার্নিচর নেই, দোর-জানলায় পর্দা পর্যন্ত নেই। দেয়ালের সারি সারি হুক দেখে বুঝলুম, এককালে নিশ্চয় বিস্তর ছবি ঝোলানো ছিল, মেঝের অবস্থা দেখে বুঝলুম এ-মেঝের উপর কখনো কোনো জুতোর চাট পড়েনি—জন্মের প্রথম দিন থেকে এর সর্বাঙ্গ গালচেতে ঢাকা ছিল। কঙ্কাল থেকে পূর্ণাবয়ব মানুষের যতখানি ধারণা করা যায়, দেয়ালের হুকের সার, ছাতের শেকলের গোছা, দরজা-জানলার গায়ে-লাগানো পরদা-ঝোলানোর ডাণ্ডা থেকে আমি নাচের ঘর, মজলিসখানা, বাজিঘরের ততখানি আন্দাজ করলুম।

শূন্য শ্মশান ভয়ঙ্কর, কিন্তু কঙ্কালের ব্যঞ্জনা বীভৎস।

এ-বাড়িতে থাকব কী করে? চুলোয় যাক প্রাশান জর্মন শেখা।

আন্দাজে বুঝলুম যে আমার জন্য যে-ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা বাড়ির প্রায় ঠিক মাঝখানে। ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার আমাকে সে-ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

বজরার মতো খাট, কিন্তু ঘরখানাও বিলের মতো। নৌকোয় চড়া অভ্যাস না হওয়া পর্যন্ত বিলের মাঝখানে নৌকোয় ঘুমুতে যে-রকম অসহায় অসহায়, ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে, সে-খাটে শুয়ে আমারো সেই অবস্থা হয়েছিল।

দুপুরে খাবার ঘরে গিয়ে দেখি বেন্‌কুয়েট টেবিলে তিনজনের জায়গা। টেবিলের এক মাথায় কর্তা, অন্য মাথায় গিন্নী, মাঝখানে আমি। একে অন্যকে কোনো জিনিস হাত বাড়িয়ে দেবার উপায় নেই বলে তিনজনের সামনেই আপন আপন নিমক-দান। মাস্টার্ড, সস মাথায় থাকুন, গোলমরিচেরও সন্ধান নেই। বুঝলুম পাঁড় প্রাশানের বাড়ি বটে। আড়ম্বরহীনতায় এদের রান্নার সামনে আমাদের বালবিধবার হবিষ্যান্নও লজ্জায় ঘোমটা টানে। কিন্তু ওসব কথা থাক, এরকম ধারা মশলার বিরুদ্ধে জেহাদ আমি অন্য জায়গায়ও দেখেছি।

ভেবেছিলুম বাড়ির কর্তাকে দেখতে পাব শুয়োরের মতো হোঁৎকা, টমাটোর মতো লাল, অসুরের মতো চেহারা, দুষমনের মতো এই-মারি-কি-তেই-মারি—অর্থাৎ সবসুদ্ধ জড়িয়ে-মড়িয়ে প্রাশান বিভীষিকা। কিন্তু যা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা হয় তেমন কিছু ইয়োরোপে নেই।

এ যেন নর্মদা-পারের সন্ন্যাসী বিলিতি কাপড় পরে পদ্মাসনে না বসে চেয়ারে বসেছেন। দেহের উত্তমার্ধ কিন্তু যোগাসনে—শিরদাঁড়া খাড়া, চেয়ারে হেলান দেননি।

শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, শুষ্ক মুখ, আর সেই শুকনো মুখ আরো পাংশু করে দিয়েছে দুখানি বেগুনি ঠোঁট। কপাল থেকে নাক নেমে এসেছে সোজা, চশমার ব্রিজের জায়গায় এতটুকু

খাঁজ খায়নি, আর গালের হাড় বেরিয়ে এসে চোখের কোটর দুটোকে করে দিয়েছে গভীর গুহার মতো। কিন্তু কী চোখ! আমার মনে হল উঁচু পাহাড় থেকে তাকিয়ে দেখছি নীচে, চতুর্দিকে পাথরে ঘেরা নীল সরোবর। কী গভীর, কী তরল! সে-চোখে যেন এতটুকু লুকোনো জিনিস নেই। যত বড় অবিশ্বাস্য কথাই এ লোকটা বলুক না কেন, এর চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা অবিশ্বাস করার জো নেই।

খেতে খেতে সমস্তক্ষণ আড়-নয়নে সেই ধ্যানমগ্ন চোখের দিকে, সেই বিষণ্ণ ঠোঁটের দিকে আর চিন্তাপীড়িত ললাটের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখছি। তখন চোখে পড়ল তাঁর খাবার ধরন। চোয়াল নড়ছে না, ঠোঁট নড়ছে না, খাবার গেলার সময় গলায় সামান্যতম কম্পনের চিহ্ন নেই।

পরনে প্রাশান অফিসারদের য়ুনিফর্ম তো নয়ই, মাথার চুলও কদম-ছাঁট নয়। ব্যাক্‌ব্রাশ করা চকচকে প্ল্যাটিনামব্লন্ড চুল।

কিন্তু সবচেয়ে রহস্যময় মনে হল এঁর বয়স। চল্লিশ, পঞ্চাশ, সত্তর হতেও বাধা নেই। বয়সের আন্দাজ করতে গিয়েই বুঝলুম নর্মদা-পারের সন্ন্যাসীর সঙ্গে এঁর আসল মিল কোনখানে।

এত অল্প খেয়ে মানুষ বাঁচে কী করে, তাও আবার শীতের দেশে? সুপ খেলেন না, পুডিং খেলেন না, খাবার মধ্যে খেলেন এক টুকরো মাংস—শ্যামবাজারের মামুলি মটন-কটলেটের সাইজ—দুটো সেদ্ধ আলু, তিনখানা বাঁধাকপির পাতা আর এক স্লাইস রুটি। সঙ্গে ওয়াইন, বিয়ার, জল পর্যন্ত না!

আহারে যত না বিরাগ তার চেয়েও তাঁর বেশি বিরাগ দেখলুম বাক্যালাপে। নতুন বাড়িতে উঠলে প্রথম লাঞ্চের সময় যে-সব গতানুগতিক সম্বর্ধনা, হাসিঠাট্টা, গ্যাস সম্বন্ধে সতর্কতা, সিঁড়ির পিচ্ছিলতা সম্বন্ধে খবরদারি সে-সব তো কিছুই হল না—আমি আশাও করিনি—আবহাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভদ্রতা-দুরস্ত কৌতূহল, এ সব কোনো মন্তব্য বা প্রশ্নের দিক দিয়ে হের ওবের্স্ট (কর্নেল মহাশয়) গেলেন না। আমিও চুপ করে ছিলুম, কারণ আমি বয়সে সকলের ছোট।

খাওয়ার শেষের দিকে যখন আমি প্রায় মনস্থির করে ফেলেছি যে, ডুটেন্‌হফারদের জিভে হয় ফোস্কা নয় বাত, তখন হের ওবের্স্ট হঠাৎ পরিষ্কার ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শেক্সপীয়ারের কোন নাট্য আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে?'

আমার পড়া ছিল কুল্লে একখানাই। নির্ভয়ে বললুম, 'হ্যামলেট।'

'গ্যেটে পড়েছেন?'

আমি বললুম, 'অতি অল্প।'

'একসঙ্গে গ্যেটে পড়ব?'

আমি আনন্দের সঙ্গে, অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে সম্মতি জানালুম। মনে মনে বললুম, 'দেখাই যাক না প্রাশান রাজপুত কী রকম কালিদাস পড়ায়। হের ওবের্স্টের চেহারাটি যদিও ভাবুকের মতো, তবু কুলোপানা চক্কর হলেই তো আর দাঁতে কালবিষ থাকে না!

ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার বললেন, 'ভদ্রলোক জর্মন বলতে পারেন।'

'তাই নাকি?' বলে সেই যে ইংরিজি বলা বন্ধ করলেন তারপর আমি আর কখনো তাঁকে ইংরিজি বলতে শুনিনি।

লাঞ্চ শেষ হতেই হের ওবের্স্ট উঠে দাঁড়ালেন। জুতোর হিলে হিলে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে স্ত্রীকে, তারপর আমাকে 'বাও' করে আপন ঘরের দিকে চলে গেলেন। বাপের বয়সী লোক, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এরকম 'বাও' করে বসবে কী করে জানব বলো! আমি হন্তদন্ত হয়ে উঠে বার বার 'বাও' করে তার খেসারতি দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু মনে মনে মাদামের সামনে বড় লজ্জা পেলুম। পাছে তিনিও আবার কোনো একটা নতুন এটিকেট চালান সেই ভয়ে—যদিও আমার কোনো তাড়া ছিল না—আমি দু'মিনিট যেতে না যেতেই উঠে দাঁড়ালুম, মাদামকে কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে 'বাও' করে নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা হলুম—হিলে হিলে ক্লিকটা আর করলুম না, জুতোর হিল্ রবরের ছিল বলে।

চারটের সময় কফি খেতে এসে দেখি হের ওবের্স্ট নেই। মাদাম বললেন, তিনি অপরাহ্ণে আর কিছু খান না। মনে মনে বললুম, বাব্বা, ইনি পওহারী বাবার কাছে পৌঁছে যাবার তালে আছেন!

ডিনারে ওবের্স্ট খেলেন তিন খানা সেনউইজ্ আর এক কাপ চা—তাও আর পাঁচজন জর্মনের মতো—বিনদুধে।'

চাচা থামলেন। তারপর গুনগুন করে অনুষ্টুপ ধরলেন—

'এবমুক্তো হৃষিকেশো গুড়াকেশেন ভারত।'

তারপর বললেন, 'আমি গুড়াকেশ নই, নিদ্রা আমি জয় করিনি। নিদ্রাই আমাকে জয় করেছেন, অর্থাৎ আমি ইন্‌সমনিয়ায় কাতর। কাজেই সংযমী না হয়েও 'যা নিশা সর্বভূতানাং' তার বেশির ভাগ আমি জেগে কাটাই। রাত তিনটের সময় শুতে যাবার আগে জানলার কাছে গিয়ে দেখি কর্তার পড়ার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে!

দেরিতে উঠি। ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে দেখি কর্তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। লজ্জা পেলুম, কিন্তু সেটা পুষিয়ে নিলুম লোহার নালে নালে এমনি বমশেল ক্লিক করে যে, মাদাম আঁৎকে উঠলেন। মনে মনে বললুম, 'হিন্দুস্থানীকি তমিজ ভী দেখ লিজিয়ে!'

ওবের্স্টকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কি অনিদ্রায় ভোগেন?' বললেন, 'না তো।' আমি কেন প্রশ্নটা শুধালুম সে সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল না দেখিয়ে শুধু স্মরণ করিয়ে

দিলেন যে দশটায় গ্যেটে-পাঠ।

পূর্ণ এক বৎসর তিনি আমায় গ্যেটে পড়িয়েছিলেন, দুটি শর্ত প্রথম দিনই আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে। তিনি কোনো পারিতোষিক নেবেন না, আর আমার পড়া তৈরি হোক আর না হোক, ক্লাস কামাই দিতে পারব না।

মিলিটারি কায়দায় লেখাপড়া শেখা কাকে বলে জানো? বুঝিয়ে বলছি। আমরা দেশকালপাত্রে বিশ্বাস করি। গুরুর যদি শরীর অসুস্থ থাকে, ছাত্রের যদি পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়, পালা-পরবে যদি কোথাও যেতে হয়, পাঠ্যপুস্তকের যদি অনটন হয়, শিক্ষক অথবা ছাত্রের যদি পড়া তৈরি না থাকে, গুর্বীর যদি ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন সংক্রান্ত কোনো বিশেষ প্রয়োজন হয়—এবং তখনকার গম-বরাদ্দের (রেশনিঙের) দিনে তার নিত্য নিত্য প্রয়োজন হত—তাহলে অনধ্যায়। কিন্তু প্রাশান মিলিটারি-মার্গ অঘটনঘটনপটিয়সী দৈবদুর্বিপাকে বিশ্বাস করে না। আমি বুকে কফ নিয়ে এক ঘন্টা কেশেছি, ক্লাস কামাই যায়নি, হিন্ডেনবুর্গ হের ওবের্স্টকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ক্লাস কামাই যায়নি। একটি বৎসর একটানা গ্যেটে, আবার গ্যেটে এবং পুনরপি গ্যেটে। তার অর্ধেক পরিশ্রমে পাণিনি কণ্ঠস্থ হয়, সিকি মেহন্নতে ফিরদৌসীকে ঘায়েল করা যায়।

অথচ পড়ানোর কায়দাটা ন' সিকে ভটচাযি। গ্যেটের খেই ধরে বাইমার, বাইমার থেকে ট্যুরিঙেন্, ট্যুরিঙেন্ থেকে পূর্ণ জর্মনির ইতিহাস। গ্যেটের সঙ্গে বেটোফেনের দেখা হয়েছিল কার্লসবাডে—সেই খেই ধরে বেটোফেনের সঙ্গীত, বাগনারে তার পরিণতি, আমেরিকায় তার বিনাশ। গ্যেটে শেষ বয়সে সরকারি গেহাইমরাট্ খেতাব পেয়েছিলেন, সেই খেই ধরে জর্মনির তাবৎ খেতাব, তাবৎ মিলিটারি মেডেল, গণতন্ত্রে খেতাব তুলে দেওয়াটা ভালো না মন্দ সে সব বিচার, এককথায় জর্মন দৃষ্টিবিন্দু থেকে তামাম ইয়োরোপের সংস্কৃতি-সভ্যতার সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস। পূর্ণ এক বৎসর ধরে গ্যেটের গোষ্পদে ইয়োরোপের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়েওঠা ইতিহাস-ঐতিহ্য বিম্বিত হল।

আর এ সব কিছু ছাড়িয়ে যেত তাঁর আবৃত্তি করার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। সে ইন্দ্রজালের মোহ বোধহয় আমার এখনো কাটেনি। আমি এখনো বিশ্বাস করি, মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায়—যে-শ্রদ্ধা, যে-অনুভূতি, যে-সংজ্ঞা নিয়ে ডুটেন্‌হফার গ্যেটে আবৃত্তি করতেন—তাহলে ঈপ্সিত ফললাভ হবেই হবে।

পূর্ণ এক বৎসর রোজ দু'ঘন্টা করে এই গুণীর সাহচর্য পেলুম, কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর নিজের জীবন অথবা তাঁর পরিবার সম্বন্ধে তিনি কখনো একটি কথাও বলেননি। কেন তিনি মিলিটারি ছাড়লেন, লুডেন্‌ডর্ফের আহ্বানে জর্মনিতে নূতন দল গড়াতে কেন তিনি সাড়া দিলেন না (কাগজে এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা হত), পেন্সন কেন তিনি ত্যাগ করলেন, না করে পারিবারিক তৈলাঙ্কন তৈজসপত্র বাঁচানো কি অধিকতর কাম্য হত

না,—এ-সব কথা বাদ দাও, একদিনের তরে ঠাট্টাচ্ছলেও তাঁকে বলতে শুনিনি, প্রথম যৌবনে তিনি সোয়া দু'বার না আড়াইবার প্রেমে পড়েছিলেন অথবা ছাত্রাবস্থায় মাতাল হয়ে ল্যাম্পপোস্টকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি' বলে কান্নাকাটি করেছিলেন কি না।

পূর্ণ এক বৎসর ধরে এই লোকটির সাহচর্য পেয়েছি, তাঁর সংযম দেখে মুগ্ধ হয়েছি—মদ না, সিগরেট না, কফি না। বার্লিনের মেরুমুক্ত হিমে মুক্ত-বাতায়ন নিরিন্ধন গৃহে ত্রি-যামা-যামিনী বিদ্যাচর্চা, আত্মসম্মান রক্ষার্থে পিতৃপিতামহসঞ্চিত আশৈশব শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রিয়বস্তু অকাতরে বিসর্জন, আহারে বিরাগ, ভাষণে অরুচি, দম্ভহীন, দৈন্যে নীলকণ্ঠ, গুড়াকেশ—সব কিছু নিয়ে এঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে এমনি অভিভূত করে ফেলেছিল যে আমি নিজের অজানায় তাঁকে অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছিলুম। ডুটেন্‌হফারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আমি যে দস্তানা, অভারকোট, টাই, কলার ছাড়লুম, আজো তা গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করিনে। কিন্তু কিসে আর কিসে তুলনা করছি!'

চাচা বললেন, 'শুধু একটা জিনিসে হের ওবের্স্টের চিত্তগতি আমি ধরতে পেরেছিলুম। আমাদের আলাপের দ্বিতীয় দিনে জিনিয়স সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জাতিভেদের কথা ওঠে। আমি মুসলমান, তার উপর ছেলেবেলায় দু' হাত তফাতে দাঁড়িয়ে বামুন পণ্ডিতকে শ্লেট দেখিয়েছি, কৈশোরে হিন্দুহস্টেলে বেড়াতে গিয়ে ঢুকতে পাইনি, জাতিভেদ সম্বন্ধে আমার অত্যধিক উৎফুল্ল হওয়ার কথা নয়। তারই প্রকাশ দিতে হের ওবের্স্ট জাতিভেদের ইতিহাস; তার বিশ্লেষণ, বর্তমান পরিস্থিতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এমনি তথ্য এবং তত্ত্বে ঠাসা কতকগুলো কথা বললেন যে আমার উষ্মার চোদ্দ আনা তখনি উবে গেল। দেখলুম, শুধু যে তিনি মনুসংহিতার জর্মন অনুবাদ ভালো করে পড়েছেন তা নয়, গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্রের তাবৎ আচার অনুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেছেন—অবশ্য সংস্কৃতে নয়, হিলেব্রান্টের জর্মন অনুবাদে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী, বৈজ্ঞানিক পরশপাথর দিয়ে বিচার করলে তার কতটা গ্রহণীয় কতটা বর্জনীয়, বিজ্ঞান যেখানে নীরব সেখানে কিংকর্তব্য এসব তো বললেনই, এবং যে সব সমস্যায় তিনি স্বয়ং কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে-সবগুলোও বিশেষ উৎসাহে আমার সামনে উপস্থিত করলেন।

অথচ কী বিনয়ের সঙ্গে দিনের পর দিন এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন—প্রাশান কৌলীন্য যেন দম্ভপ্রসূত না হয়। প্রাশান কৌলীন্য জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবী করে না, তার দাবী শুধু এইটুকু যে তার বিশেষত্ব আছে। সে-বিশেষত্বটুকুও যদি পৃথিবী স্বীকার না করে, তাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু অন্ততপক্ষে পার্থক্যটুকু যেন স্বীকার করে নেয়। হের ওবের্স্ট তাতেই সন্তুষ্ট। তিনি সেইটুকুই বাঁচিয়ে রাখতে চান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস,

সে-পার্থক্যের জন্য 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' রয়েছে।

এবং সেই পার্থক্যটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দেখতে হবে রক্তসংমিশ্রণ যেন না হয়।

নীটশের সুপারম্যান?

না, না। শুধু বড় হওয়ার জন্য বড় হওয়া নয়, শুধু 'সুপার' হওয়ার জন্য 'সুপার' হওয়া নয়। প্রাশান আদর্শ হবে ত্যাগের ভিতর দিয়ে, আত্মজয়ের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক হওয়ার।

এবং যদি দরকার হয়, তার জন্য সংগ্রাম পর্যন্ত করা। সেবা করার জন্য যদি দরকার হয় তবে যে-সব অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ তার অন্তরায় হয় তাদের বিনাশ করা।

আমাব কাছে বড় আশ্চর্য ঠেকল। সেবার জন্য সংগ্রাম, বাঁচবার জন্য বিনাশ?

হের ওবের্স্ট বলতেন, 'শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেন যুদ্ধ করতে বলেছিলেন? সেইটে বার বার পড়তে হয়, বুঝতে হয়। ভুললে চলবে না, জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি লোকসেবায় যেন নিয়োজিত হয়।'

আমি প্রথম দিনের আলোচনার পরই বুঝতে পেরেছিলুম হের ওবের্স্টের সঙ্গে তর্ক করা আমার ক্ষমতার বহু, বহু উর্ধ্বে কিন্তু এই 'সেবার জন্য সংগ্রাম' বাক্যটা আমার কাছে বড়ই আত্মঘাতী, পরস্পরবিরোধী বলে মনে হল। রক্তসংমিশ্রণ ঠেকাবার জন্য প্রাণবিসর্জন, এও যেন আমার কাছে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি মনে হল। আমার কোন কোন জায়গায় বাধছে হের ওবের্স্টের কাছে সেগুলোও অজানা ছিল না।

লক্ষ্য করলুম, এঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্পভাষণে। কিন্তু স্বল্প হলে কী হয়, শব্দের বাছাই, কল্পনার ব্যঞ্জনা, যুক্তির ধাপ এমনি নিরেট ঠাসবুনুনিতে বক্তব্যগুলোকে ভরে রাখত যে সেখানে সূচ্যগ্র ঢোকাবার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। এবং আরো লক্ষ্য করলুম যে একমাত্র রক্তসংমিশ্রণের ব্যাপারেই তিনি যেন ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

বিষয়টি যে তাঁর জীবনের কত বিরাট অংশ দখল করে বসে আছে সেটা বুঝতে পারলুম একদিন রাত প্রায় দুটোর সময় যখন তিনি আমার ঘরে এসে বললেন, 'এত রাতে এলুম, কিছু মনে করবেন না। আমাদের আলোচনার সময় একটি কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সেটি হচ্ছে, 'সুখদুঃখ, জয়পরাজয়, লাভক্ষতি যিনি সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন, একমাত্র তাঁরই অধিকার সেবার ভার গ্রহণ করার, সেবার জন্য সংগ্রাম করার।'

কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে হিল-ক্লিকের সঙ্গে 'বাও' করে বেরিয়ে গেলেন।

এত রাত্রে এসে এইটুকু বলার এমন কী ভয়ঙ্কর প্রয়োজন ছিল?

হের ওবের্স্টের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি, বাড়ির লনে পাইচারি করেছি, পৎস্‌দাম

পেরিয়ে ছোট ছোট গ্রামে গিয়ে চাষাদের বাড়িতে খেয়েছি, পুরোনো বইয়ের দোকানে প্রাচীন মাসিক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, অধিকাংশ সময় তিনি চুপ, আমিও চুপ। তাঁকে কথা বলাতে হলে প্রাশান ঐতিহ্যের প্রস্তাবনা করাই ছিল প্রশস্ততম পন্থা। একদিন শুধালুম, 'ফ্রান্সের সঙ্গে আপনাদের বনে না কেন?'

হের ওবের্স্ট বললেন, 'না বনাই ভালো। এ রকম ধ্বংসমুখ দেশ পৃথিবীতে আর দুটো নেই। প্যারিসের উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল বিলাস দেখেছেন? কোনো সুস্থ জাতির পক্ষে এরকম নির্লজ্জ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সম্ভব?'

আমি বললুম, 'বার্লিনেও 'কাবারে' আছে।'

হের ওবের্স্ট বললেন, 'বার্লিন জর্মনি নয়, প্রাশার প্রতীক নয়, কিন্তু প্যারিস ফ্রান্স এবং ফ্রান্স প্যারিস।'

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলুম। হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। যে-সমস্যা মানুষের মনকে অহরহ আন্দোলিত করে, শেষ পর্যন্ত সে-সমস্যা নিজের জীবনে, নিজের পরিবারের জীবনে কতটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তাই নিয়ে মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় একদিন না একদিন আলোচনা করে। হের ওবের্স্টকে কখনো আলোচনার সে দিকটা মাড়াতে দেখিনি।

ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারকে আমি অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গল্পকাহিনী বলতুম। হের ওবের্স্টের তুলনায় যদিও তাঁর সঙ্গে দেখা হত কম, তবু তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল বেশি। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হের ওবের্স্টের সঙ্গে নানা আলোচনা হয়, কিন্তু আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, না জেনে হয়তো আমি এমন বিষয়ের কথা পাড়ব যাতে তাঁর আঘাত লাগতে পারে। আমার বিশ্বাস তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন—তাই এ-প্রশ্ন শুধালুম।'

ফ্রাউ ডুটেন্‌হকার অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখের ভাব থেকে মনে হল তিনি মনে মনে 'বলি কি বলি না' করছেন। শেষটায় ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের পরিবারের কথা কখনো পাড়বেন না। আমাদের ষোল বছরের ছেলেটি ফ্রান্সের লড়াইয়ে মারা গেছে, আমাদের মেয়ে—'

কথার মাঝখানে ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার হঠাৎ দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন। এই বেকুব গোমূর্খামির জন্য আমি মনে মনে নিজেকে খুব জুতো-পেটা করলুম। অতটা বুদ্ধি কিন্তু তখনো ছিল যে এ সব অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে বিপদ বাড়িয়ে তোলা হয় মাত্র। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। প্রাশানরা হয়তো তখনো হিল ক্লিক করে।

বড় ছেলে মরে যাওয়াতে বয়স্ক চাষাকে একদম ভেঙে পড়তে দেখেছি। তার তখন

দুঃখ সে মরে গেলে তার খেত-খামার দেখবে কে। সভ্যতা কুলটুরের পয়লা কাতারের শহরে তারি পুনরাবৃত্তি দেখলুম ডুটেন্‌হফার পরিবারে। এত ঐতিহ্য, এত সাধনা, এত ভবিষ্যতের স্বপ্ন সব এসে শেষ হবে এই ডুটেন্‌হফারে?

তাই কি এত কৃচ্ছ্রসাধন, রক্তসংমিশ্রণের বিরুদ্ধে এত তীব্র হুঙ্কার? যে বর্ষায় সফল বৃষ্টি হয় না সেই বর্ষাতেই কি দামিনীর ধমক, বিদ্যুতের চমক বেশি?

তাই হের ওবের্স্টের পড়াশুনোরও শেষ নেই। সভ্য অসভ্য বর্বর বিদগ্ধ দুনিয়ার তাবৎ জাতির নৃতত্ত্ব, সমাজগঠন, ধর্মনীতি পড়েই যাচ্ছেন, পড়েই যাচ্ছেন। শীতের রাতে আগুন না জ্বালিয়ে ঘরের ভিতর ঘন্টার পর ঘন্টা পাইচারি, বসন্তে বেখেয়ালে বৃষ্টিতে জবজব হয়ে বাড়ি ফেরা, গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিবস বিদেশী মুসলমানকে প্রাশান ধর্মের মূল তত্ত্বে ওকিবহাল করার অন্তহীন প্রয়াস, হেমন্তের পাতা-ঝরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে না জানি কোন নিষ্ফল বৃক্ষের কথা ভেবে ভেবে চিত্তের লুকানো কোণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।

কিন্তু আমার সামনে তিনি কখনো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেননি। এসব আমার নিছক কল্পনাই হবে।

এক বৎসর ঘুরে এল। আমি ততদিনে পুরো পাক্কা প্রাশান হয়ে গিয়েছি। চেয়ারে হেলান না দিয়ে বসি, সুপে গোলমরিচের গন্ধ পেলে ঝাড়া পনেরো মিনিট হাঁচি, একটানা বারো ঘন্টা কাজ করতে পারি, তিন দিন না ঘুমুলেও চলে—যদিও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আমার নিদ্রাকৃচ্ছ্রতা তখন অনেকটা সেরে গিয়েছে—কাঠের পুতুলের মতো খটখট করে হাঁটা রপ্ত হয়ে গিয়েছে, আর আমার জর্মন উচ্চারণ শুনে কে বলবে আমি ভাত-খেকো, নেটিব, কালা-আদমী। সঙ্গে সঙ্গে এ-বিশ্বাসও খানিকটে হল যে হের ওবের্স্টের হৃদয় বলে যদি কোনো রক্তমাংসে গড়া বস্তু থাকে, তবে তার খানিকটে আমি জয় করতে পেরেছি।

এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আমার জীবনের প্রাশান-পর্বকে তার কুরুক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দিল।

কলেজ থেকে ফিরেছি। দোরের গোড়ায় দেখি একটি যুবতী পেরেমবুলেটরের হ্যান্ডেলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন। চেহারাটি ভারি সুন্দর, হুবহু হের ওবের্স্টের মতো। তিনিও সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে কথা নেই। আমিও দাঁড়ালুম, প্রাশান এটিকেট যদিও সে-অবস্থায় কাউকে সেখানে দাঁড়াতে কড়া বারণ করে। তবুও যদি কেউ দাঁড়ায় তবে সেই প্রাশান এটিকেটেরই অলঙ্ঘ্য আদেশ, হের ওবের্স্ট তাকে মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। তিনি এটিকেট লঙ্ঘন করলেন—সেই প্রথম আর সেই শেষ।

আমি তখন আর প্রাশান না। আমার মুখোস খসে পড়েছে। আমি ফের কালা-আদমী

হয়ে গিয়েছি। আমি নড়ব না।

মেয়েটি কী বললেন বুঝতে পারলুম না।

হের ওবের্স্ট বললেন, 'তোমাকে আমি একবার বলেছি, আমার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করার চেষ্টা করবে না। তাই আর এক বার, শেষবারের মতো বলছি, তুমি যদি আবার এরকম চেষ্টা করো, তবে আমাকে বাধ্য হয়ে তোমার সন্ধানের বাইরে যেতে হবে।'

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। ছুটে গেলুম ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের কাছে। বললুম, 'আপনার মেয়ে দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে। আপনার স্বামী তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

তিনি পাথরের মতো বসে রইলেন। আমি তাঁকে হাত ধরে তুলে সদর দরজার দিকে নিয়ে চললুম। করিডরে শুনি দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। দেখি, হের ওবের্স্ট ফিরে আসছেন। আমি তখন ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটলুম মেয়েটির সন্ধানে। তাঁকে পেলুম বাড়ির সামনের রাস্তায়। তখনো কাঁদছেন। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলুম, তাঁর ঠিকানা টুকে নিয়ে এলুম।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের উপর আমার নামে একখানা চিঠি। ঋজু, শক্ত, প্রাশান হাতে হের ওবের্স্টের লেখা। আমার বুক কেঁপে উঠল। খুলে পড়লুম—

আপনার কর্তব্যবুদ্ধি আপনাকে যে-আদেশ দিয়েছিল আপনি তাই পালন করেছেন। আমি তাতে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু এর পর আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে না।

আপনার বাড়ি পেতে কোনো কষ্ট হবে না জেনেই বৃথা সময় নষ্ট না করে আপনাকে আমার বক্তব্য জানালুম।'

হের ওবের্স্টকে ততদিনে এতটা চিনতে পেরেছিলুম যে, তাঁর হৃদয় থাক আর নাই থাক, তাঁর প্রতিজ্ঞার নড়চড় হয় না। পরদিন সকালবেলা ডুটেন্‌হফারদের বাড়ি ছাড়লুম। হের ওবের্স্টের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করিনি। ফ্রাউ কপালে চুমো খেয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।'

আড্ডা এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। কে যেন জিজ্ঞেস করল—সকলের হয়ে—'কিন্তু মেয়েটির দোষ কী ছিল?'

চাচা বললেন, 'হের ওবের্স্টের গোর দিতে যাই তার প্রায় বৎসরখানেক পরে। সেখানে শুনলুম, তাঁর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে বিয়ে করেছিলেন, এবং তিনি জাতে ফরাসী।'

মুখুয্যের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর অধ্যাপক কী বলছিল রে? বর্ণসঙ্কর-ফঙ্কর

আবোল-তাবোল কথা! বর্ণসঙ্করের প্রতি দরদ দেখিয়েছিলুম বলে হের ওবের্স্ট তাঁর জীবনের শেষ সঙ্গীকে অকাতরে অপাঙক্তেয় করলেন।

এবং নিজে? অর্ধ-অনশনে তাঁর মৃত্যু হয়। আমাকে না তাড়ালে হয়তো তিনি আরো বহুদিন বাঁচতেন। তিনি আর কোনো পেয়িং-গেস্ট নিতে রাজি হননি। একে নিরম্বু উপবাসে মৃত্যু বলা চলে না সত্যি, কিন্তু এরও একটি পদবী থাকা উচিত। কী বলো গোঁসাই?'

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা বলল, 'শেষ ট্রেন মিস করেছি।'

চাচা বললেন, 'চ, প্রাশান কায়দায় পাঁচ মাইল ডবল-মার্চ করা দেখিয়ে দিই।'

মা-জননী

যুদ্ধের পূর্বে লন্ডনে অগুনতি ভারতীয় নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি করত। তাদের জন্য হোটেল, বোর্ডিং হৌস তো ছিলই, ডাল-রুটি, মাছ-ভাত খাওয়ার জন্য রেস্তোরাঁও ছিল প্রয়োজনের চেয়ে অধিক।

বাদবাকি সমস্ত কন্টিনেন্টে ছিল মাত্র দুটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। প্যারিসের র‍্যু দ্য সমোরারের 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ও বার্লিনের 'হিন্দুস্থান হৌস'।

লন্ডন ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে উদাসীন কিন্তু বার্লিন ভারতীয়দের খাতির করত। তাই অর্থাভাব সত্ত্বেও 'হিন্দুস্থান হৌস' কায়ক্লেশে যুদ্ধ লাগা পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে 'হিন্দুস্থান হৌস' নাৎসি আন্দোলনের চেয়েও প্রাচীন, কারণ ১৯২৯-এ হৌসের যখন পত্তন হয় তখনো হিটলার বার্লিনে কল্কে পাননি।

সেই 'হিন্দুস্থান হৌসে'র এক কোণে বাঙালিদের একটা আড্ডা বসত। সে-আড্ডার ভাষাবিদ সূয্যি রায়, লেডি-কিলার পুলিন সরকার, বেটোফেনজ্ঞ মদনমোহন গোস্বামী বার্লিন সমাজের অশোক-স্তম্ভ কুতুব-মিনার হয়ে বিরাজ করতেন। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা। 'হিন্দুস্থান হৌসে'র ভিতরে বাহিরে তাঁর প্রতিপত্তি কতটা তা নিয়ে আমরা কখনো আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করিনি, কারণ চাচা ছিলেন বয়সে সকলের চেয়ে বড়, দানে-খয়রাতে হাতিম-তাই, আর সলা-পরামর্শে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

এঁদের সকলকেই লুফে নেবার জন্য বার্লিনের বিস্তর ড্রইং-রুম খোলা থাকা সত্ত্বেও এঁরা সুবিধে পেলেই 'হিন্দুস্থান হৌসে' এসে আড্ডা জমাতেন। এ-স্বভাবটাকে বাঙালির দোষ এবং গুণ দুইই বলা যেতে পারে।

আড্ডা জমেছে। সূয্যি রায় চুকচুক করে বিয়ার খাচ্ছেন। লেডি-কিলার পুলিন সরকার চেস্টনাট ব্রাউন আর ব্রুনেট চুলের তফাৎটা ঠিক কোন জায়গায় তাই নিয়ে একখানা থিসিস ছাড়ছে, চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চোখ বন্ধ করে আপন ভাবনা ভেবে যাচ্ছেন, এমন সময় আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া সদস্য, রায়ের 'প্রতেজে' বা 'দেশের ছেলে', গ্রাম-সম্পর্কে ভাগ্নে গোলাম মৌলা এসে তার মামার পাশে বসল। তার চোখে-মুখে অদ্ভুত বিহ্বলতা—লাস্ট ট্রেন মিস করলে কয়েক মিনিটের তরে মানুষ যে-ভাব নিয়ে বোকার মতো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকটা সেই রকম।

রায় শুধালেন, 'কী রে, কী হয়েছে? প্রেমে পড়েছিস?'

গোলাম মৌলা বড্ড লাজুক ছেলে। বয়স সতের হয় কি না হয়, বাপ কট্টর খেলাফতি, ছেলেকে কী দেশে কী বিলেতে ইংরেজের আওতায় আসতে দেবেন না বলে সেই অল্পবয়সেই বার্লিন পাঠিয়েছেন। 'সূয্যিমামা' না থাকলে সে বহুকাল আগেই বার্লিন ছেড়ে পালাত। কথা কয় কম, আর বড়দের ফাইফরমাস করে দেয় অনুরোধ বা আদেশ করার আগেই।

বলল, 'আমার ল্যান্ডলেডি আর তার মেয়েতে কী ঝগড়াটাই না লেগেছে যদি দেখতেন! মা নাচে যাচ্ছে, কিছুতেই মেয়েকে নিয়ে যাবে না। মেয়ে বলছে যাবেই।'

রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মায়ের বয়স কত রে?'

'চল্লিশ হয়নি বোধ হয়।'

'মেয়ের?'

'আঠারো হবে।'

রায় বললেন, 'তাই বল! এতে তোর এত বেকুব বনার কী আছে রে? মা-মেয়ে যদি একসঙ্গে নাচে যায় তবে মায়ের বয়স ভাঁড়াতে অসুবিধা হবে না?'

মৌলা বলল, 'কী ঘেন্না! মেয়েটাও দেমাক করে বলছিল, সে থাকলে নাকি মায়ের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। আমি ভাবলুম, রাগের মাথায় বলছে, কিন্তু কী ঘেন্না! মায়ে-মেয়ে এই নিয়ে লড়াই!' মৌলার বিহ্বলতা কেটে গিয়েছে, আর তার জায়গায় দেখা দিয়েছে তেতো-তেতো ভাব।

আড্ডা তর্কাতর্কির বিষয় পেয়ে যেন রথের নারকোলের উপর লাফিয়ে পড়ল। একদল বলে বাচ্চার জন্য মায়ের ভালোবাসা অনুন্নত সমাজেই পাওয়া যায় বেশি, অন্য দল বলে ভারতের একান্ন-পরিবার সভ্যতার পরাকাষ্ঠা, আর একান্ন-পরিবার খাড়া আছে মা-জননীদের দয়ামায়ার উপর। লেডি-কিলার সরকারকে জর্মনরা বলত 'Schuerzenjaeger' অর্থাৎ 'এপ্রন-শিকারী', কাজেই সে যে মা-মেয়ে সকলের পক্ষ নিয়ে লড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী, আর গোঁসাই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের মা যশোদার কাছে মা-মেরির মাদন্নারূপ নিতান্ত পানসে।

রায় তর্কে যোগ দেননি। কথা কাটাকাটি কমলে পরে বললেন, 'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? হবে হবে, কলকাতা-বোম্বাই সর্বত্রই আস্তে আস্তে মায়ে-মেয়ে রেষারেষি আরম্ভ হবে।'

তখন চাচা চোখ মেললেন। বললেন, 'সে কি হে রায়সায়েব! তুমিও একথা বললে? তার চেয়ে কথাটা পাল্টে দিয়ে বলো না কেন, জর্মনিতেও একদিন আর এ-লড়াই থাকবে না। এখনকার অবস্থা তো আর স্বাভাবিক নয়। বেশির ভাগ ল্যান্ডলেডিই বিধবা, আর যাদের বয়স ষোলর উপরে, তারাই বা বর জোটাবে কোত্থেকে? আরো বহুদিন ধরে

চলবে কুরুক্ষেত্রের শত বিধবার রোদন। ১৪-১৮টা কুরুক্ষেত্রের চেয়ে কম কোন হিসেবে?'

গোঁসাই বললেন, 'কিন্তু'—

চাচা বললেন, 'তবে শোনো।

কর্নেল ডুটেন্‌হফারের বাড়ি ছাড়ার বৎসরখানেক পরে হঠাৎ আমাকে টাকাপয়সা বাবদে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। তখনকার দিনে বার্লিনে পয়সা কামানো আজকের চেয়েও অনেক বেশি শক্ত ছিল। মনে মনে যখন ভাবছি ধন্ন্যাটা কোন চাকরী নিয়ে শুরু করব, অর্থাৎ ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুটে অনুবাদকের, খবরের কাগজে কলামনিস্টের, না ইংরিজি ভাষার প্রাইভেট ট্যুটরের, এমন সময়ে ফ্রলাইন ক্লারা ফন্ ব্রাখেলের সঙ্গে দেখা। আমি একটা অত্যন্ত নচ্ছার রেস্তোরাঁ থেকে বেরুচ্ছি, তিনি তাঁর মের্ৎসেডেজ্ হাঁকিয়ে যাচ্ছেন। গাড়িতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লাইনার ইডিয়োট্, কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছ নাকি, এরকম প্রলেতারিয়া রেস্তোরাঁয় লবাব-পুত্তুর কী ভেবে?'

'তোমরা জানো, আমাকে 'ক্লাইনার ইডিয়োট্' অর্থাৎ 'হাবাগঙ্গারাম' বলার অধিকার ক্লারার আছে।'

আড্ডা ঘাড় নাড়িয়ে যা জানাতে চাইল তার অনুবাদ এককথায়—'বিলক্ষণ'।

চাচা বললেন, 'ততদিনে আমার জর্মন শেখা হয়ে গিয়েছে। উত্তর দিলুম ডাকসাইটে কবিতায়—

> 'কাইনেন্ ট্রোপ্‌ফ্‌ষেন্ ইন্ বেষার্ মেয়ার্,
> উন্ট্ ডেয়ার বয়টেল্ শ্লাপ্ উন্ট্ লেয়ার্।।
>
> গেলাসেতে নেই এক ফোঁটা মাল আর।
> ট্যাঁক ফাঁকা মাঠ, বেবাক পরিষ্কার।।'

ক্লারা বললেন, 'পয়সা যদি কামাতে চাও তবে তার বন্দোবস্ত আমি করে দিতে পা' আমার পরিচিত এক 'হঠাৎ-নবাবের' ছেলের যক্ষ্মা হয়েছে। একজন সঙ্গীর দরকার। খাওয়া-থাকা তো পাবেই, মাইনেও দেবে ভালো। ওরা থাকে রাইনল্যান্ডে। বার্লিনের তুলনায় গরমে সাহারা।'

আমি রাজি হলুম। দু'দিন বাদ টেলিফোনে চাকরি হয়ে গেল। হানোফার হয়ে কলন পৌঁছলুম।'

মৌলা শুধাল, 'যেখান থেকে 'ও দ্য কলন' আসে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দাম এখানে যা, কলনেও তা। তারপর কলনে গাড়ি বদল করে বন্, বন্

থেকে গোডেসবের্গ্‌। রাইন নদীর পারে। স্টেশনের চেহারাটা দেখেই জানটা তর হয়ে গেল। ভারি ঘরোয়া ঘরোয়া ভাব। ছোট্ট শহরখানির সঙ্গে জড়িয়ে মড়িয়ে এক হয়ে আছে। গাছপালায় ভর্তি—বার্লিনের তুলনায় সোঁদরবন।

'হঠাৎ-নবাব'ই বটে। না হলে জর্মনির আপন খাসা মের্ৎসেডেজ থাকতে রোল্‌স কিনবে কেন? ড্রাইভার ব্যাটাও উর্দি পরেছে মানওয়ারি জাহাজের এ্যাডমিরালের।

কিন্তু কর্তা-গিন্নীকে দেখে বড় ভালো লাগল। 'হঠাৎ-নবাব' হোক আর যাই হোক, আমাকে এগিয়ে নেবার জন্য দেখি দেউড়ির কাছে লনে বসে আছেন। খাতির-যত্নটা যা করলেন, আমি যেন কাইজারের বড় ব্যাটা। দু'জনাই ইয়া লাশ—কর্তা বিয়ার খেয়ে খেয়ে, গিন্নী হুইপট্‌ ক্রীম গিলে গিলে। কর্তার মাথায় বিপর্যয় টাক আর গিন্নীর পা দু'খানা ফাইলেরিয়ায় ফুলে গিয়ে আগাগোড়া কোলবালিশের মতো একাকার। দু'জনেই কথায় কথায় মুচকি হাসেন—ছোট্ট মুখ দু'খানা তখন চতুর্দিকে গাদা গাদা মাংসের সঙ্গে যেন হাতাহাতি করে কোনো গতিকে আত্মপ্রকাশ করে, এবং সে এতই কম যে তার ভিতর দিয়ে দাঁতের দর্শন মেলে না।

জিরিয়েজুরিয়ে নেওয়ার পর আমি বললুম, 'এইবার চলুন, আপনাদের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাক।' তখন কর্তা গিন্নীকে ঠেলেন, গিন্নী কর্তাকে। বুঝতে পারলুম ছেলের অসুখে তাঁরা এতই বিহ্বল হয়ে গিয়েছেন যে সামান্যতম কর্তব্যের সামনে দু'জনেই ঘাবড়ে যান—পাছে কোনো ভুল হয়ে যায়, পাছে তাতে করে ছেলের রোগ বেড়ে যায়।

যদি জানা না থাকত যে যক্ষ্মায় ভুগছে তাহলে আমি কার্লকে ওলিম্পিকের জন্য তৈরি হতে উপদেশ দিতুম। কী সুন্দর সুগঠিত দেহ—যেন গ্রীক ভাস্কর শাস্ত্র মিলিয়ে মেপেজুপে প্রত্যেকটি অঙ্গ নির্মাণ করেছেন, কোনো জায়গায় এতটুকু খুঁত ধরা পড়ে না। আর সান-বাথ নিয়ে নিয়ে গায়ের রঙটি আমাদের দেশের হেমন্তের পাকাধানের রঙ ধরেছে, চোখ দুটি আমাদেরই শরতের আকাশের মতো গভীর আসমানি।

ঘরে আরেকটি প্রাণী উপস্থিত ছিল, নিতান্ত সাদামাটা চেহারা, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী—রোগীর নার্স। গিন্নী আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদেরই শহর স্টুটগার্টের মেয়ে, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কার্লের সেবার ভাবনা আমাদের এতটুকুও ভাবতে হয় না। আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

একে নিয়েই আমার অভিজ্ঞতা।'

লেডি কিলার সরকার বলল, 'কিন্তু বললেন যে নিতান্ত সাদামাটা?'

রায় বললেন, 'চোপ!'

চাচা কোনো কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'অভিজ্ঞতাটা এমনি মর্মন্তুদ যে সেটা আমি চটপট বলে ফেলি। এ জিনিস ফেনিয়ে বলার নয়।

মেয়েটির নাম সিবিলা। প্রথম দর্শনে নার্সদের কায়দামাফিক গম্ভীর সরকারি চেহারা নিয়ে টেম্পারেচারের চার্টের দিকে এমনিভাবে তাকিয়েছিল, যেন চার্টখানা হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে যাবার চেষ্টা করলে সে সেটাকে খপ করে ধরে ফেলবে। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই টের পেলুম, সে কার্লকে যত না নিখুঁত সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তার চেয়ে ঢের বেশি প্রাণরস যোগাচ্ছে হাসিখুশী, গালগল্প দিয়ে। সাদামাটা চেহারা—কিন্তু সেটা যতক্ষণ সে অন্যের প্রতি উদাসীন ততক্ষণই—একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে চোখমুখ যেন নাচতে থাকে, ড্যাবডেবে পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যে-রকম ধারা হয়। কারো কথা শোনার সময়ও এমনভাবে তাকায়, মনে হয় যেন চোখ দিয়ে কথা গিলছে। তার উপর গানের ফোয়ারা তার ছিল অন্তহীন—গ্যেটে, হাইনে, ম্যোরিকে, র‍্যুকের্টের কথা, বেটোফেন, ব্রামস, শুমান, মেন্ডেলজোনের সুর দিয়ে গড়া যে-সব গান সে কখনো কার্লের জন্য চেঁচিয়ে, কখনো আপন মনে গুনগুনিয়ে গেয়েছে, তার অর্ধেক ভাণ্ডারও আমি অন্য কোনো এমেচারের গলায় শুনিনি।

কিন্তু কয়েকদিনের ভিতরেই লক্ষ্য করলুম, কথা বলার মাঝখানে সিবিলা আচমকা কেমনধারা আনমনা হয়ে যায়, খানার টেবিলে হঠাৎ ছুরি-কাঁটা রেখে দিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, আর প্রায়ই দেখি অবসর সময়ে রাইনের পারে একা একা বসে ভাবছে। দু-একবার নিতান্ত পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছি—সিবিলা কিন্তু দেখতে পায়নি। ভাবলুম নিশ্চয় প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কখন, আর কার সঙ্গে?

এমন সময় একদিন গিন্নী আমায় খাঁটি খবরটা দিলেন। ভদ্রমহিলা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়েই আমাকে সব কিছু বললেন, কারণ তাঁর স্বামী কার্লের অসুখের ব্যাপারে এমনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে গিন্নী খবরটা তাঁর কাছে ভাঙতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

সিবিলা অন্তঃসত্ত্বা এবং অবিবাহিতা। পাঁচমাস। আর বেশিদিন চলবে না। পাড়ায় কেলেঙ্কারি রটে যাবে।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়নি। আমি গিন্নীকে বললুম, 'সিবিলা চলে গেলেই পারে।'

গিন্নী বললেন, 'যাবে কোথায়, খাবে কী? এ-অবস্থায় চাকরী তো অসম্ভব, মাঝখান থেকে নার্সের সার্টিফিকেটটি যাবে।'

আমি বললুম, 'তা হলে কর্তাকে না জানিয়ে উপায় নেই।'

গিন্নীর আন্দাজ ভুল। কর্তা খবরটা শুনে দু'হাত দিয়ে মাথার চুল ছেঁড়েননি, রেগেমেগে চেল্লাচেল্লিও করেননি। প্রথম ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন. 'সিবিলার সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা না বলে উপায় নেই। কিন্তু আমি মনিব, সে কর্মচারী এবং ব্যাপারটা সঙ্গিন। আপনার মতো কেউ যদি মধ্যস্থ থাকে, তবে বড় উপকার হয়। অথচ জিনিসটা আপনার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হবে বলে আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস

পাচ্ছি না।'

আমি রাজি হলুম।

সিবিলা টেবিলের উপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদল। কর্তা-গিন্নী দু'জনই খাঁটি লোক, সিবিলাকে এ বিপদ থেকে কী করে উদ্ধার করা যায় তার উপায় অনুসন্ধান করলেন অনেক, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হল না। তার কারণটাও আমি বুঝতে পারলুম। একদিকে বিচক্ষণ সংসারী লোক পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মাথায় কাবুতে আনার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে গ্যেটে-হাইনের স্নেহ-প্রেমের কবিতায় ভরা, অনুভূতির ভাপে-ঠাসা জালে-পড়া সবৎসা সচকিতা হরিণী। ইনি বলছেন, 'পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জাল ছেঁড়ো'। ও বলছে, 'ছোঁড়াছুঁড়ি করলে বাচ্চা হয়তো জখম হবে।'—ইনি জিজ্ঞেস করছেন, 'বাচ্চার বাপ কে?' ও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বোঝাচ্ছে, 'তাতে কোনো লাভ নেই। সে বিবাহিত ও অত্যন্ত গরীব।'

বুঝলুম, সিবিলার মনস্থির, সে মা হবেই।

কেঁদে কেঁদে টেবিলের একটা দিক ভিজিয়ে ফেলেছে।'

চাচা স্পর্শকাতর বাঙালি, কাজেই তাঁর গলায় বেদনার আভাস পেয়ে আড্ডার কেউই আশ্চর্য হল না।

চাচা বললেন, 'দেশে আমার বোন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বাড়ি ফিরেছে। মা খুশি, বাবা খুশি। দু'দিন আগে নির্মমভাবে যে-বোনের চুল ছিঁড়েছি তার জন্যে তখন কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা দুপুর পাড়া চষি। তার শরীরের বিশেষ যত্ন নেওয়ার কথা উঠলেই সে মিষ্টি হাসে—কী রকম লজ্জা, খুশি আর গর্বে মেশানো। ছোট বোনরা কাঁথা সেলাই করে, আর বাবার বন্ধু বুড়ো কবরেজ মশায় দু'বেলা গলা খাঁকারি দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন।

আর এ-মেয়েও তো মা হবে।

থাক সে-সব কথা। শেষটায় স্থির হল যে কিছুই স্থির করবার উপায় নেই। উপস্থিত সিবিলা কাজ করে যাক, যখন নিতান্তই অচল হয়ে পড়বে তখন তাকে নার্সিংহোমে পাঠানো হবে। আমি পরে কর্তাকে বললুম, 'কিন্তু বাচ্চাটার কী গতি হবে সে কথাটা তো কিছু ভাবলেন না।' কর্তা বললেন, 'এখন ভেবে কোনো লাভ নেই। বিপদ-আপদ কাটুক, তখন বাচ্চার প্রতি সিবিলার কী মনোভাব সেইটে দেখে ব্যবস্থা করা যাবে।'

প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিবিলা কাজ করেছিল। কিন্তু শেষের দিকে তার গান গাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার বোন এমনিতে গান গাইত না। সে শেষের দিকে গুনগুন করতে আরম্ভ করেছিল।

বাচ্চা হল। আহা, যেন একমুঠো জুঁই ফুল!

কিন্তু তখন আরম্ভ হল আসল বিপদ। বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে দিতে সিবিলা কিছুতেই রাজি হয় না। বলে, কোনো পরিবারে যেন সে আশ্রয় পায়। কিন্তু এরকম পরিবার

পাওয়া যায় কোথায়? অনুসন্ধান করলে যে পাওয়া একেবারে অসম্ভব তা নয়, কিন্তু জর্মনির সে দুর্দিনে, ইনফ্লেশনের গরমিতে মানুষের বাৎসল্যরস শুকিয়ে গিয়েছে—আর তার চেয়েও বড় কথা, অতটা সময় আমাদের হাতে কই?

রোজ হয় ফোন, নয় চিঠি। নার্সিংহোম বলে সিবিলাকে নিয়ে যাও। এখানে বেড্ দখল করে সে শুধু আসন্নপ্রসবাদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

এদিকে কর্তা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, পয়সা দিয়ে এজেন্সির লোককে লাগানো, আপন বন্ধুবান্ধবদের কাছে অনুসন্ধান কিছুই বাদ দেননি। আমাকে পর্যন্ত দু'তিনবার কলন, ড্যুসেলডর্ফ হয়ে আসতে হল। নার্সিংহোমের তাড়া খেয়ে কর্তার ভুঁড়ি গিরে আষ্টেক কমে গেল। কী মুশকিল!

সব কিছু জানতে পেরে তখন সিবিলাই এক আজব প্যাঁচ খেলে আমাদের দম ফেলার ফুর্সৎ করে দিল। নার্স তো বটে, এমনি এক বিদঘুটে ব্যামোর খাসা ভান করলে যে পাঠশালার মিটমিটে শয়তান আর হলিউডের ভ্যাম্পে মিললেও ফল এর চেয়ে ভালো ওতরাতো না। ক্নুট হামসুন বলেছেন, 'প্রেমে পড়লে বোকা বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে, বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়।' সিবিলার মতো ভিতরে-বাইরে সাদামাটা মেয়ে বাচ্চার মঙ্গলের জন্য ফন্দিবাজ হয়ে উঠলো।

এমন সময় কর্তা—কারবারে যাকে বলে ভালো 'পার্টি'র খবর পেলেন। অগাধ পয়সা, সমাজে উঁচু, শিক্ষিত পরিবার। কিন্তু আমাদের এজেন্ট বলল 'পার্টি'—অর্থাৎ ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী—কড়া শর্ত দিয়েছেন যে সিবিলা এবং আমাদের অন্য কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পাবে না, এবং কথা দিতে হবে যে জানবার চেষ্টা করবে না, যে কারা সিবিলার বাচ্চাকে গ্রহণ করলেন। এ শর্ত কিছু নতুন নয়, কারণ কল্পনা করা কিছু অসঙ্গত নয় যে সিবিলা যদি একদিন হঠাৎ তার বাচ্চাকে ফেরত চেয়ে বসে তখন নানা বিপত্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর কিছু না হোক বাচ্চাটা যদি জানতে পেরে যায় তার আসল মা কে, তাহলেই তো উৎকট সঙ্কট।

কর্তার মতো ব্যবসায়ের পাঁজে পোড়-খাওয়া ঝামাও এ-প্রস্তাব নিয়ে নার্সিংহোমে যাননি। সব কিছু চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন। দু'দিন পরে উত্তর এল, সিবিলা রাজি।

মনস্থির করতে সিবিলার দু'দিন লেগেছিল। সে আটচল্লিশ ঘন্টা তার কী করে কেটেছিল, জানি না। বাড়িতে আমরা তিনজন নিঃশব্দে লাঞ্চ-ডিনার খেয়েছি, একে অন্যে চোখাচোখি হলেই একসঙ্গে সিবিলার দ্বিতীয় প্রসব-বেদনার কথা ভেবেছি। আইন মানুষকে এক পাপের জন্য সাজা দেয় একবার, সমাজ কতবার, কত বৎসর ধরে দেয় তার সন্ধান কোনো কেতাবে লেখা নেই, কোনো বৃহস্পতিও জানেন না।

ট্রাঙ্ক-কলে ট্রাঙ্ক-কলে সব বন্দোবস্ত পাকাপাকি করা হল। কর্তা সিবিলাকে নিয়ে

স্টেশনে যাবেন। 'পার্টি'র ওয়েট-নার্স (ধাই) বাচ্চার জন্য ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করবে। সিবিলা স্টুটগার্টের ট্রেন ধরলে পর কর্তা বাচ্চাটিকে সেই ধাইয়ের হাতে সঁপে দেবেন। 'পার্টি' কড়াক্কড় জানিয়েছেন, সিবিলা যেন ওয়েট-নার্সকেও না দেখতে পায়।

যে দিন সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবার কথা, সেদিন দুপুরবেলা কার্লের গলা দিয়ে একঝলক রক্ত উঠল। ছ'মাস ধরে টেম্পারেচর, স্প্যুটাম কাবুতে এসে গিয়েছিল, এ-পি বন্ধ ছিল, তারপর হঠাৎ সাদা দাঁতের উপর কাঁচা রক্তের নিষ্ঠুর ঝিলিমিলি। আমরা তিনজনাই সামনে ছিলাম। কর্তারই কী একটা রসিকতায় হাসতে গিয়ে ব্যাপারটা ঘটল। ছেলের মন ভালো রাখবার জন্য ভদ্রলোক অনেক ভেবেচিন্তে রসিকতাখানা তৈরি করেছিলেন। অবস্থাটা বোঝো! আমি তাঁকে হাত ধরে নিজের ঘরে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করতে ছুটলুম।

আমাকে কর্তা-গিন্নী এতদিন ধরে যে আদর-আপ্যায়ন করেছেন তার প্রতিদানে যদি সে-সন্ধ্যায় কর্তার বদলে আমি সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে না যেতুম তাহলে নিছক নিমক-হারামি হত। হার্ট নিয়ে কর্তা আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। আমি নার্সিংহোম যাচ্ছি শুনে আমার হাতে সিবিলার ছ'মাসের জমানো মাইনে দিলেন। গিন্নী নিজের থেকে আরো কিছু, আর আপন হাতে বোনা বাচ্চার জন্য একজোড়া মোজা দিলেন।

গোডেসবের্গ ছোট শহর। কিন্তু নার্সিংহোম থেকে স্টেশন যেতে হলে দুটি বড় রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হয়। আমি স্টিয়ারিঙে, সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে পিছনে। ইচ্ছে করেই ড্রাইভারকে সঙ্গে নিইনি, এবং ট্রেনটাও বাছা হয়েছে রাত্রের, যাতে করে খামকা বেশি জানাজানি না হয়। তার মাইনে তাকে দিয়েছি। মোজার মোড়ক যখন সে খুলল তখন আমি সে দিকে তাকাইনি।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি—ঝাঁকুনিতে কাঁচা বাচ্চার অনিষ্ট হয় কি না হয় তা তো জানিনে। থেকে থেকে সিবিলা আমার কাঁধের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি ঠিক জানেন যাঁদের বাড়িতে আমার বুবি যাচ্ছে তাঁরা ভালো লোক?' আমি আমার সাধ্যমতো তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি আর ভাবছি কর্তা এলেই ভালো হত। তিনি সমস্ত জিনিসটা নিশ্চয়ই আরো গুছিয়ে করতে পারতেন।

সিবিলা একই প্রশ্ন বারে বারে শুধায়, তাঁরা লোক ভালো তো? আমি ভাবছি যদি শুধায় তাঁরা ভালো আমি কী করে জানলুম, তা হলেই তো গেছি। আমার কেন কর্তারও তো সে সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। কিন্তু যখন সিবিলা সে প্রশ্ন একবারও শুধালো না তখন বুঝতে পারলুম, তার কাছে অজানার অন্ধকার আধা-আলোর দ্বন্দ্বের চেয়ে অনেক বেশি কাম্য হয়ে উঠেছে। জেরা করলে যদি ধরা পড়ে যায়—যদি ধরা পড়ে যায় যে আমার উত্তরে রয়েছে শুধু ফাঁকি? তখন? তখন সে মুখ ফেরাবে কোন দিকে,

কোথায় তার সান্ত্বনা?

সিবিলা বলল, 'গাড়ি থামান একটু দয়া করে। ঐ তো খেলনার দোকান। আমার বুবির তো কোনো খেলনা নেই।' তাইতো, কর্তা, আমি দু'জনেই এদিকে একদম খেয়াল করিনি। কিন্তু একমাসের শিশু কি খেলনা বোঝে?

একগাদা খেলনা নিয়ে সিবিলা গাড়িতে ঢুকল।

দশ পা যেতে না যেতেই সিবিলা বলল, 'ঐ তো জামা-কাপড়ের দোকান। বুবির তো ভালো জামা নেই। গাড়ি থামান।' থামালুম। এবার বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে সে দোকানে ঢুকলো, জিনিস বয়ে আনতে অসুবিধে হতে পারে ভেবে আমিও সঙ্গে গেলুম।

দোকানি যেটা দেখায় সেটাই কেনে। কোনো বাছবিচার না, দাম জিজ্ঞেস করা না। দোকানি পর্যন্ত কেনার বহর দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'বুবির এখন বাড়ন্ত বয়স, জামাগুলো দু'দিনেই ছোট হয়ে যাবে না?'

বলে করলুম পাপ। সিবিলা বলল, 'ঠিকতো'—আর কিনতে আরম্ভ করল সব সাইজের জামা, পাতলুন, মোজা, টুপি। আমি হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষটায় বললুম, 'ফ্রলাইন সিবিলা, ট্রেনের বেশি দেরি নেই।' সিবিলা বলল, 'চলুন'।

আরো দশ পা। সিবিলা হুকুম করল, 'থামান।'

এবারে কী কিনল ভগবানই জানেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দোকানপাট একটা একটা করে বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে। সিবিলা বলে, 'থামান', সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গাড়ি থেকে নেবে পড়ে, আর ছুটে গিয়ে দোকানিকে দরজা বন্ধ করতে বারণ করে। যে-দোকান দেখে বন্ধ হচ্ছে, ছুটে যায় সে-দোকানেরই দিকে। ছুটোছুটিতে চুল এলোথেলো হয়ে গিয়েছে, পাগলিনীর মতো এদিক-ওদিক তাকায়—সে একাই লড়বে সব দোকানির সঙ্গে। কেন? একদিনের তরে তারা দোকানগুলো দু'মিনিট বেশি খোলা রাখতে পারে না? আমি বার বার অনুনয় করছি, 'ফ্রলাইন সিবিলা, বিট্টে বিট্টে, প্লীজ প্লীজ, জায়েন্ জী ফেরনুন্ফ্টিষ্, একি করছেন? গাড়ি ধরব কী করে?' সিবিলা কোনো কথায় কান দেয় না। আমার মাথায় কুবুদ্ধি চাপল, ভাবলুম একটু জোরজার করি। বললুম, 'এত সব জিনিসের কী প্রয়োজন?'

চকিতের জন্য সিবিলা বাঘিনীর ন্যায় রুখে দাঁড়াল। হুঙ্কার দিয়ে 'কী?' বলেই থেমে গেল। তারপর হঠাৎ ঝরঝর করে চোখের জল বেরিয়ে এল।

চাচা বললেন, 'আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। খোদার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলুম সিবিলার পরীক্ষা সহজ করে দেবার জন্য।'

তারপর আমি আর বাধা দিইনি। যায় যাক দুনিয়ার বেবাক ট্রেন মিস্ হয়ে। বিশ্বসংসার যদি তার জন্য আটকা পড়ে যায় তবে পড়ুক। আমি বাধা দেব না।

বোধ হয় টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। সিবিলা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কাছে আমার আর কোনো পাওনা আছে?' আমি বললুম, 'না, কিন্তু আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি দিতে পারি।' বলল, 'পাঁচটা মার্ক দিন, একখানা আ-বে-ৎসের বই কিনব।'

এক মাসের শিশু বই পড়বে!

গাড়ির পিছনটা জিনিসে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে আমার পাশে বসল। তার হাতের বেলুন উড়ে এসে আমার স্টিয়ারিঙে বাধা দিচ্ছে। সিবিলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

স্টেশনে যখন পৌঁছলুম, তখন গাড়ি আসতে কয়েক মিনিট বাকি। গোডেসবের্গ ছোট স্টেশন, ডাকগাড়ি দু'মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না। আমি বাচ্চাটাকে নেবার জন্য হাত বাড়ালুম কোনো কথা না বলে। সিবিলা বলল, 'প্ল্যাটফর্মে চলুন, গাড়ি ছাড়লে পর—'। আমি কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললুম।

পোর্টারই দেখিয়ে দিল কোন জায়গায় দাঁড়ালে সেকেন্ড ক্লাস ঠিক সামনে পড়বে। আমি সিবিলাকে আরো পঞ্চাশটি মার্ক দিলুম।

সিবিলা সিগনেলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের অন্ধকারের মাঝখানে তার দৃষ্টি ডুবে গিয়েছে। তার কোলে বুবি। ভগবানের জুঁই একরাতেই শুকিয়ে যায়, সিবিলার জুঁই যেন অক্ষয় জীবনের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুমুচ্ছে।

সিবিলা আমার হাতে বাচ্চাকে তুলে দিল। একমুহূর্তের তরে সব কিছু ভুলে গিয়ে বলল, 'আপনি তো বেশ বাচ্চা কোলে নিতে জানেন! আমাদের পুরুষরা তো পারে না।'

আমি আরাম বোধ করলুম। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পোর্টার সিবিলার সুটকেস তুলে দিয়েছে।

হঠাৎ সিবিলা সেই পাথরের প্ল্যাটফর্মে হাঁটুগেড়ে আমার দু' হাঁটু জড়িয়ে হা-হা করে কেঁদে উঠল। সে কান্নায় জল নেই, বাষ্প নেই। বিকৃত কণ্ঠে বলল—

আমায় কথা দিন, ঈশ্বরের শপথ, কথা দিন আপনি বুবির খবর নেবেন সে ভালো আছে কি না। মা মেরির শপথ—না, না, মা মেরির না—আপনার মায়ের শপথ, কথা দিন।'

আমি আমার মায়ের নামে শপথ করলুম। 'পার্টি' যা বলে বলুক, যা করে করুক।

পোর্টার হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। সিবিলাকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিল।

গাড়ির গায়ে চলার পূর্বের কাঁপন লেগেছে। এমন সময় আমার আর সিবিলার কামরার মাঝখান দিয়ে একটি মহিলা ধীরে-সুস্থে ছোট্ট একটি ছেলের হাত ধরে ধরে চলে

গেলেন। সিবিলা দোরে দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের লক্ষ্য করল কি না বলতে পারিনে, হঠাৎ দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।

আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

আমি বাধা দিলুম না।

তীর্থহীনা

ভারতবর্ষের লোক এককালে লেখাপড়া শেখবার জন্য যেত কাশী-তক্ষশিলা। মুসলমান আমলেও কাশী-মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি, ছাত্রের অভাবও হয়নি। তবে সঙ্গে সঙ্গে আরবী-ফারসী শিক্ষারও দুটি কেন্দ্র দেওবন্দ আর রামপুরে গড়ে উঠল। ইংরেজ আমলে সবকটাই নাকচ হয়ে গিয়ে শিক্ষা-দীক্ষার মক্কা-মদিনা হয়ে দাঁড়াল অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ। ভটচায-মৌলবী কোন দুঃখে কাশী-দেওবন্দ উপেক্ষা করে ছেলে—এমন কি মেয়েদেরও—বিলেত পাঠাতে আরম্ভ করলেন তার আলোচনা করে আজ আর লাভ নেই।

কিন্তু ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করল। 'অসহযোগী' ছাত্রদের কেউ কেউ বিলেতে না গিয়ে গেল বার্লিন। এদের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে শেষটায় ১৯২৯-এ এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যার উপর ভর করে একটা রেস্তোরাঁ চালান সম্ভবপর হয়ে উঠল। তাই বার্লিনে 'হিন্দুস্থান হৌসে'র পত্তন।

সেদিন 'হিন্দুস্থান হৌসে'র আড্ডা ভালো করে জমছিল না। কোত্থেকে এক পাদ্রীসায়েব এসে হাজির। খোদায় মালুম কে তাকে বলেছে, এখানে একগাদা হিদেন ঝামেলা লাগায়। প্রভু খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনতে না শুনতেই এরা ঝাঁকে ঝাঁকে প্রভুর শরণ নেবে ও সুবে বার্লিনিস্থানে পাদ্রীসায়েবের জয়জয়কার পড়ে যাবে। অবশ্যি তাঁর ভুল ভাঙতে খুব বেশি সময় লাগেনি। গোঁসাই সঙ্গীতরসজ্ঞ, আর এ-দুনিয়ার তাবৎ সঙ্গীতই গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। কাজেই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তিনি ধর্মবাবদে খানিকটা ওকিবহাল। বললেন, 'সায়েব, খ্রীষ্টধর্ম যে উত্তম ধর্ম তাতে আর কী সন্দেহ, কিন্তু আমাদের কাছে তো শুধু এই ধর্মটাই ভোট চাইছে না, হিন্দু-মুসলমান আরো দুটো ডাঙর কেন্ডিডেট রয়েছে যে! গীতা পড়েছ?'

তখন দেখা গেল পাদ্রী কুরান পড়েনি, গীতার নাম শোনেনি, আর ত্রিপিটক উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনবার হোঁচট খেল।

ঘণ্টাখানেক তর্কাতর্কি চলেছিল। ততক্ষণে ওয়েট্রেস পাশের একটা বড় টেবিলে আড্ডার ডাল-ভাত-চচ্চড়ি সাজিয়ে ফেলেছে। চাচা পাদ্রীকে দাওয়াত করলেন হিদেন্‌খানা চেখে দেখতে। সায়েব বিজাতীয় আহারের দিকে একটিবার নজর বুলিয়েই অনেক ধন্যবাদ

দিয়ে কেটে পড়ল।

চাচা বললেন, 'দেখলি, অচেনা রান্না পরখ করে দেখবার কৌতূহল যার নেই সে যাবে অজানা ধর্মের সন্ধানে! গোঁসাই, তুমি বৃথাই শক্তিব্যয় করছিলে।'

সূয্যি রায় মাস্টার্ড পেতলে নিয়ে কাসুন্দীর মতো করে লুচির সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, 'ব্যাটা গ্যেটেও পড়েনি নিশ্চয়। গ্যেটে বলেছেন, ''যে বিদেশ যায়নি সে কখনো স্বদেশের স্বরূপ চিনতে পায়নি।'' ধর্মের বেলাও তাই।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু অনেক কঠিন। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম, কিন্তু বিদেশে যাওয়ার জন্য স্থূল ট্রেন রয়েছে, স্থূলতর জাহাজ রয়েছে, আর টমাস কুকরা তো আছেই। বিদেশে নিয়ে যাবার জন্য ওরাই সবচেয়ে বড় আড়কাঠি, অর্থাৎ মিশনরি। আর এতই পাকা মিশনরি যে ওরা সকলের পকেটে হাত বুলিয়ে দুপয়সা কামায়ও বটে। কিন্তু ধর্মের মিশনরিদের হল সবচেয়ে বড় দেউলে প্রতিষ্ঠান।'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বলল, 'কিন্তু কী দরকার বাওয়া এসব বখেড়ার? বার্লিন শহরটা তো ধর্ম বাদ দিয়েও দিব্যি চলছে।'

চাচা বললেন, 'বাদ দিতে চাইলেই তো আর বাদ দেওয়া যায় না। শোন।

আমি যখন রাইনল্যান্ডের গোডেস্‌বের্গ শহরে ছিলুম, তখন ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে আমার অল্প অল্প পরিচয় হতে আরম্ভ হল। না হয়ে উপায়ও নেই। বার্লিনের হৈ-হুল্লোড় গির্জেগুলোকে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছে আর রাইনল্যান্ডের গির্জার সঙ্গীত তামাম দেশটাকে বন্যায় ভাসিয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> 'দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
> উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
> দুয়েকটি তান—'

এতো তাও নয়। এখানে সমস্ত দেশব্যাপী সঙ্গীতবন্যা আর তার মাঝখানে আমি ক্যাথলিক নই বলে শাখামৃগের মতো একটা গাছের ডগা আঁকড়ে ধরে বসে প্রাণ বাঁচাব এ ব্যবস্থা আমার কিছুতেই মনঃপূত হল না—তার চাইতে বাউলের উপদেশই ভালো, 'যে জন ডুবলো সখী, তার কি আছে বাকি গো?'

সমস্ত সপ্তাহের অফুরন্ত কাজ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, বার্লিনের লোক খানিকটে ঠাণ্ডা করে সারা রবির সকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কিন্তু রাইনের জীবন বিলম্বিত একতালে। তাই রবির সকাল রাইনের দ্রষ্টব্য বস্তু।

কাচ্চা-বাচ্চারা চলেছে রঙ-বেরঙের জামাকাপড় পরে, কতকগুলো করছে কিচির-মিচির, কতকগুলো বা মা-বাপের কথামতো গির্জার গাম্ভীর্য জোর করে মুখে মাখবার চেষ্টা করছে, মেয়েরা যেতে যেতে দোকানের শার্সিতে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে

হ্যাটটা আধ ইঞ্চি এ-দিক ও-দিক করে নিচ্ছে, গ্রামভারি গাঁওবুড়োরা রবিবারের নেভি-ব্লু সুট পরে চলেছেন গিন্নীদের সঙ্গে ধীরে-মন্থরে, আর যে সব অথর্ব বুড়ো-বুড়ি সপ্তাহের ছদিন ঘরে বসে কাটান তাঁরা পর্যন্ত চলেছেন লাঠিতে ভর করে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে, অথবা হুইল-চেয়ারে বসে ছেলে-ভাইপোর মোলায়েম ঠেলা খেয়ে খেয়ে—বাচ্চারা যেরকম-ধারা পেরেম্বুলেটরে করে হাওয়া খেতে বেরোয়। জোয়ানদের ভিতর গির্জায় যায় অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু যারা যায় তাদের মুখে ফুটে উঠেছে প্রশান্ত ভাব—এরা গির্জার কাছ থেকে এখনো অনেক কিছু আশা করে, ধর্ম এখনো তাদের কাছে লোকাচার হয়ে যায়নি।

দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তার কারবারি ভিড় নেই। শহর-গ্রাম শান্ত, নিস্তব্ধ। তাই শোনা যাচ্ছে গির্জার ঘন্টা—জনপদ, হাটবাট, তরুলতা, ঘরবাড়ি সবই যেন গির্জার চুড়ো থেকে ঢেলে-দেওয়া শান্তির বারিতে অভিষিক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

চাচা থামলেন। বোধ করি বার্লিনের কলরবের মাঝখানে রাইনের সে ছবির বর্ণনা তাঁর নিজের কাছেই অদ্ভুত শোনাল। খানিকটে ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এহ বাহ্য। ক্যাথলিক ধর্ম ক্রিশ্চানের দৈনন্দিন জীবনে কতটুকু ঠাঁই পেয়েছে জানিনে, কিন্তু গির্জার ভিতরে তার যে রূপ সে না দেখলে, না শুনলে বর্ণনা দিয়ে সে-জিনিস বোঝাবার উপায় নেই।

মানুষ তার হৃদয়, তার চিন্তাশক্তি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার শোকনৈরাশ্য দিয়ে বিরাট ব্রহ্মকে আপন করে নিয়ে কত রূপে দেখেছে তার কি সীমা-সংখ্যা আছে? ইহুদিরা দেখেছে য়েহোভাকে তাঁর রুদ্ররূপে, পারসিক দেখেছে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বের প্রতীক রূপে, ইরানি সুফী তাঁকে দেখেছে প্রিয়ারূপে, মরমিয়া বৈষ্ণব তাঁকে দেখেছে কখনও কৃষ্ণরূপে কখনও রাধারূপে, আর ক্যাথলিক তাঁকে দেখেছে মা-মেরির জননীরূপে।

তাই মা-মেরির দেবী-মূর্তি লক্ষ লক্ষ নরনারীর চোখের জল দিয়ে গড়া। আর্ত পিপাসার্ত বেদনাতুর হিয়া যখন পৃথিবীর কোনোখানে আর কোনো সান্ত্বনার সন্ধান পায় না, তখন তার শেষ ভরসা মা মেরির শুভ্র কোল। যে মা-মেরি আপন দেহজাত সন্তান কণ্টকমুকুটশির যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় পলে পলে মরতে দেখলেন তাঁর চোখের সামনে, তিনি কি এই হতভাগ্য কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়বেদনা বুঝতে পারবেন না? নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তিনি আজ বসে আছেন দিব্য সিংহাসনে—তাঁর অদেয় কিছুই নেই, মানুষের অশ্রুবারি সপ্তসিন্ধু হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডতে হানা দিলেও তিনি সে-সপ্তসিন্ধু মুহূর্তের ভিতরেই করাঙ্গুলি নির্দেশে শুকিয়ে দিতে পারেন। তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ক্যাথলিক গির্জায় গির্জায়

ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী। তুমি প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছ। রমণী

জাতির মধ্যে তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার দেহজাত সন্তান যীশু। মহিমাময়ী মা-মেরি, এই পাপীতাপীদের তুমি দয়া কর, আর দয়া কর যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।

কত হাজার বার শুনেছি আমি এই প্রার্থনা। এই 'আভে-মারিয়া' উপাসনামন্ত্র খ্রীষ্টবৈরী ইহুদী সম্প্রদায়ের মেন্ডেলজোনকে পর্যন্ত যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তারই ফলে মেন্ডেলজোন সুর দিয়েছেন মেরিমন্ত্রকে। ক্যাথলিকরা সেই সুরে মেরিমন্ত্র গেয়ে বিশ্বজননীকে আবাহন করে অষ্টকুলাচলশিরে, সপ্তসমুদ্রের পারে পারে।

কত লক্ষবার শুনেছি আমি এই প্রার্থনা। পুরুষের সবলকণ্ঠে, বৃদ্ধার অর্ধস্ফুট অনুনয়ে, শিশুর সরল উপাসনায় মিলে গিয়ে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় সে মন্ত্র তখন আর শুধু ক্যাথলিকদের নিজস্ব প্রার্থনা নয়, সে প্রার্থনায় সাড়া দেয় সর্ব আস্তিক, সর্ব নাস্তিক।

হঠাৎ মন্ত্রোচ্চারণ ছাপিয়ে সমস্ত গির্জা ভরে ওঠে যন্ত্রধ্বনিতে। বিরাট অর্গান সুরের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে গির্জার শেষ কোণ, ভিজিয়ে দিয়েছে পাপীর শুষ্কতম হৃদয়। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে উপরের দিকে সে-গম্ভীর যন্ত্ররব, আর তার সঙ্গে গেয়ে ওঠে সমস্ত গির্জা সম্মিলিত কণ্ঠে—

"ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী।"

সেই উর্ধ্বদিকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত সঙ্গীতের প্রতীক উর্ধ্বশির ক্যাথলিক গির্জা। মানুষের যে-প্রার্থনা যে-বন্দনা অহরহ মা-মেরির শুভ্র কোলের সন্ধানে উর্ধ্বপানে ধায় তারই প্রতীক হয়ে গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে উর্ধ্বদিকে। লক্ষ লক্ষ গির্জার লক্ষ লক্ষ শিখর মা-মেরির দিব্যসিংহাসনের পার্থিব স্তম্ভ।'

চাচা চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর চোখ মেলে গোঁসাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গোঁসাই, রবিঠাকুরের সেই গানটা গাও তো

"বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
উর্ধ্বমুখে নরনারী।"

গোঁসাই গুন্‌গুন্ করে গান গাইলেন। গাওয়া শেষ হলে চাচা বললেন, 'গির্জার ক্যাথলিক ধর্মসঙ্গীত তোমরাও শুনেছ কিন্তু তার করুণ দিকটা কখনো লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে।

একদিন যখন আমি এই 'আভে মারিয়া' সঙ্গীতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চিলের মত উপরের দিকে উঠে যাচ্ছি—বাহ্যজ্ঞান প্রায় নেই—তখন হঠাৎ শুনি আমার পাশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। চেয়ে দেখি একটি মেয়ে চোখের জলে প্রেয়ার-বুক রাখার হাইবেঞ্চ আর তার পায়ের কাছে খানিকটে জায়গা ভিজিয়ে দিয়েছে। অর্গান আর পাঁচশ' গলার তলায়

লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েটি আপন কান্না কেঁদে নিচ্ছে।

পুব-বাংলার ভাটিয়ালি গানে আছে রাধা ভেজা কাঠ জ্বালিয়ে ধুঁয়ো বানিয়ে কৃষ্ণ-বিরহের কান্না কাঁদতেন। শাশুড়ি-ননদী জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ধুঁয়ো চোখে ঢুকছে বলে চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। শুনেছি বাঙালি মেয়েও নাকি নির্জনে কাঁদবার ঠাঁই না পেলে স্নানের ঘরে কল ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে হাউহাউ করে কাঁদে।

গির্জায় মেয়েটির কান্না দেখে আমি জীবনে প্রথম বুঝতে পারলুম, রাধার কান্না, বাঙালি মেয়ের কান্না কত নিরন্ধ্র অসহায়তা থেকে ফেটে বেরোয়।

তখন বুঝতে পারলুম, গির্জা থেকে বেরোবার সময় যে অনেক সময় দেখেছি এখানে-ওখানে জলের পোঁচ সে ছাতার জল নয়, মেঝে ধোওয়ার জলও নয়, সে জল চোখের জল।

কুরান শরীফে আছে কুমারী মরীয়ম (মেরি) যখন গর্ভযন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন তখন লোকচক্ষুর অগোচরে গিয়ে খেজুর গাছ জড়িয়ে ধরে তিনি লজ্জায় দুঃখে আর্তনাদ করেছিলেন, 'ইয়া লায়তানি, মিত্তু কবলা হাজা—হায়, এর আগে আমি মরে গেলুম না কেন? মানুষের চোখের থেকে মন থেকে তাহলে আমি নিস্তার পেতুম।'

লোকচক্ষুর অগোচরে যাবারও যাদের স্থান নেই তাদের জন্য ভিজে কাঠের ধুঁয়ো আর স্নানের ঘরের কল খুলে দেওয়া।

তাই সর্ব অসহায় সর্ব বিপন্ন নরনারীর চোখের জল মুক্তার হার হয়ে দুলছে মা-মেরির গলায়, তারই নাম 'আভে মারিয়া' মন্ত্র—'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী'।'

গোঁসাই ভাল কীর্তন গাইতে পারেন, সহজেই কাতর হয়ে পড়েন। বললেন, 'চাচা, আর না।'

চাচা বললেন, 'মেয়েটিকে চিনতে পারলুম। কার্লকে এক্সরে করাতে গিয়ে ডাক্তারের ওয়েটিং-রুমে মেয়েটির মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রমহিলা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে। এরও যক্ষ্মা। তবে কি নিরাময় হবার জন্য কাঁদছিল? কে জানে?'

চাচা বললেন, 'তারপর একমাস হয়ে গিয়েছে, এমন সময় নাস্তিক উইলির সঙ্গে রাস্তায় দেখা। আমার গির্জা যাওয়া নিয়ে সে হামেশাই হাসি-মস্করা করত, কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মের মূল তত্ত্ব তার অজানা ছিল না। উইলি 'মুক্তপুরুষ', কিন্তু আর পাঁচজনের জন্য যে ধর্মের প্রয়োজন সে কথা সে মানত। আমায় জিজ্ঞেস করল আমি য়ুডাস টাডেয়াসের তীর্থে যাবার সময় তার মাসিমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব কি না? আমি শুধালুম য়ুডাস টাডেয়াস তীর্থ সাপ না ব্যাঙ তার কোনো খবরই যখন আমার জানা নেই তখন সে তীর্থে

আমার যাবার কোনো কথাই ওঠে না। শুনে উইলি যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'সে কি হে, টাডেয়াস তীর্থের নাম শোনোনি, আর ক্যাথলিকদের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম!'

তারপর উইলি আমায় সালঙ্কারে বুঝিয়ে দিল, রাইন-নদীর ওপারে হাইস্টারবাখার রোট। সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে টাডেয়াস তীর্থ। সে তীর্থের দেবতা বল, পীর বল, বড়কর্তা হচ্ছেন সেন্ট য়ুডাস টাডেয়াস। বড় জাগ্রত পীর। ভক্তিভরে ডাকলে পরীক্ষা তো নিশ্চিত পাস হবে, যথেষ্ট ভক্তি থাকলে জলপানিও পেতে পার। আর যদি মেয়েছেলে ঠাকুরকে ডাকে তবে সে নির্ঘাৎ বর পাবে— আশী বছরের বুড়ির পক্ষে বাইশ বছরের বর পাওয়াও নাকি ঠাকুরের কৃপায় সসিজ্-বিয়ার (অর্থাৎ ডাল-ভাত)।

বুঝলুম ঠাকুর খাসা বন্দোবস্ত করেছেন। নদীর এ-পারের বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোকরারা যাবে তাঁর কাছে পরীক্ষা পাসের লোভে, মেয়েরা যাবে বরের লোভে— দু'দলে তীর্থে দেখা হবে। তারপর কন্দর্প ঠাকুর তো রয়েছেনই টাডেয়াস ঠাকুরের সহকর্মী হয়ে স্বর্গের একসিকিউটিভ কমিটিতে। অর্থাৎ এ তীর্থে যেতে যে মেয়ে পশ্চাৎপদ নয় তার কপালে সপ্তপদী আছেই আছে।

উইলি পইপই করে বুঝিয়ে দিল, তীর্থ না করে ক্যাথলিক ধর্মের মূলতত্ত্বে কেউ কখনো প্রবেশ করতে পারেনি—উইলির নিজস্ব ভাষায় বলতে গেলে, ক্যাথলিক ধর্ম যে কতটা কুসংস্কারে নিমজ্জিত তা তীর্থে না গিয়ে বোঝা যায় না। যীশুর ক্রস নিয়ে মাতামাতি, পোপকে বাবাঠাকুর বলে কলুর বলদের মতো ঠুলি পরে তাঁর চতুর্দিকে ঘোরা তীর্থযাত্রার কুসংস্কারের কাছে নস্যি।

তাহলে তো যেতে হয়।

পাড়ার পাদ্রীসায়েবকে যখন আমার সুমতির খবর দিলুম তখন তিনি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। মনে হল, আমার যখন ধর্মে এত অচলা ভক্তি তখন যে আমি এমন জব্বর পরবটাতে গরহাজির থাকব না তা তিনি আগে থেকেই ধরে নিয়েছিলেন।

গডেসবের্গ থেকে আমরা জন তিরিশেক দল বেঁধে পাদ্রীসায়েবের নেতৃত্বে ট্রাম ধরে বন্ পৌঁছলুম। বেরোবার সময় কার্লের মা আমার হাতে তুলে দিলেন প্রেয়ার-বুক বা উপাসনা-পুস্তিকা, আর একগাছা রোজারি বা জপ-মালা। বন্ পৌঁছে দেখি সেখানেই তীর্থের ঝামেলা লেগে গিয়েছে। এক গডেসবের্গেরই বিস্তর চেনা-অচেনা লোককে দেখতে পেলুম। এক আশী বছরের বুড়িকে দেখে আমি ভয়ে আঁৎকে উঠলুম—আমার বয়স তখন বাইশ। হয়তো উইলি ভুল বলেনি। পালাই পালাই করছি এমন সময় পাদ্রীসায়েব আমাকে জোর করে বসিয়ে দিলেন সেই যক্ষ্মারোগিণী আর তার মায়ের কাছে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপও হল—ভুল বললুম, পরিচয় হল, কারণ সামান্যতম

সৌজন্যের মৃদুহাস্য বা অভ্যর্থনা পর্যন্ত সে করল না।

উইলির মাসি ইতিমধ্যে না-পাত্তা। খবর নিয়ে শুনলুম, পীরের দর্গায় জ্বালাবার জন্য মোমবাতি কিনতে গিয়েছেন। সেকি কথা! বিলিতী পীরের খাসা ইলিকটিরি রয়েছে, মোমবাতির কী প্রয়োজন? আমাদের না হয় সাপের দেশ, বিজলি-বাতিও নেই—পিদিম-মশাল না হলে পীরের অসুবিধা হয়। উইলি ঠিকই বলেছে, ধর্ম মাত্রই মোমবাতির আধা-আলোর কুসংস্কারে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পছন্দ করে, বিজলির কড়া আলোতে আত্মপ্রকাশ করতে চায় না।

মাসির আবার কড়া নজর। মোমবাতি কেনার ঠেলাঠেলিতেও আমার উপর চোখ রেখেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, গ্রেটের সঙ্গে কী করে পরিচয় হল। তারপর মাসি যা বললেন তার থেকে গ্রেটের কান্নার অর্থ পরিষ্কার হল। গোঁসাইয়ের পদাবলীতে খণ্ডিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বিপ্রলব্ধা নামের নানা নায়িকার পরিচয় আছে, এ বেচারী তার একটাতেও পড়ে না। এ মেয়ে বালবিধবার চেয়েও হতভাগিনী, এর বল্লভ হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়। পরে খবর পাওয়া গেল পয়সার লোভে অন্যত্র বিয়ে করার জন্য গ্রেটেকে সে বর্জন করেছে। বালবিধবার অন্তত এটুকু সান্ত্বনা থাকে, তার প্রেম অপমানিত হয়নি।

মাসি বললেন, "কিন্তু আশ্চর্য, পুরো দু'বৎসর আমরা কেউ বুঝতে পারিনি গ্রেটের প্রাণে কতটা বেজেছে। মেয়েটা চিরকালই হাসি-তামাসা করে সময় কাটাত—দু'বছর তাতে কোনো হেরফের হল না। তারপর হল যক্ষ্মা। তখন বোঝা গেল, যে-আপেলের ভিতরে পোকা সে আপেলটারই বাইরের রঙের বাহার বেশি"।'

চাচা বললেন, 'আমি বাঙাল দেশের লোক। যা-তা নদী আমার চোখে চটক লাগাতে পারে না। তবু স্বীকার করি, রাইন নদী কিছু ফেলনা নয়। দুদিকে পাহাড়, তার মাঝখান দিয়ে রাইন সুন্দরী নেচে নেচে চলে যাবার সময় দুপাড়ে যেন দুখানা সবুজ শাড়ি শুকোবার জন্য বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সে শাড়ি দুখানা আবার খাঁটি বেনারসী। হেথায় লাল ফুলের কেয়ারী হোথায় নীল সরোবরের ঝলমলানি, যেন পাকা হাতের জরির কাজ।

আর সেই শাড়ির উপর দিয়ে আমাদের ট্রাম যেন দুষ্টু ছেলেটার মতো কারো মানা না শুনে ছুটে চলেছে। মেঘলা দিনের আলো-ছায়া সবুজ শাড়িতে সাদা-কালোর আল্পনা এঁকে দিচ্ছে আর তার ভিতর চাঁপা রঙের ট্রামের আসা-যাওয়া— সমস্ত ব্যাপারটা যেন বাস্তব বলে মনে হয় না। মনে হয় হঠাৎ কখন রাইন সুন্দরীর ধমকে দুষ্টু ছেলেগুলো পালাবে, আর সুন্দরী তাঁর শাড়িখানা গুটিয়ে নিয়ে সবুজের লীলাখেলা ঘুচিয়ে দেবেন।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ হলুম মোকামে পৌঁছে, ট্রাম থেকে নেমে সেখানে রাইনের দিকে তাকিয়ে। দেখি রাইনের বুকের উপর ফুটে উঠেছে দুটি ছোট ছোট পল্লবঘন দ্বীপ। তার

পেলব সৌন্দর্য আমার মনে যে তুলনাটি এনে দিল, নিতান্ত বেরসিকের মনেও সেই তুলনাটাই আসত। তাই সেটা আর বলছি না—সর্বজনগ্রাহ্য তুলনা রসিয়ে বলতে পারেন যিনি যথার্থ গুণী—শিপ্রাবল্লভ কালিদাস এ রকম একজোড়া দ্বীপ দেখতে পেলে মেঘদূতকে আর অলকায় পাঠাতেন না, এইখানেই শেষবর্ষণ করতে উপদেশ দিতেন।'

লেডি-কিলার পুলিন সরকাব কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সূয্যি রায়ের ধমক খেয়ে চুপ করে গেল।

চাচা বললেন, 'হাইস্টারবাখার রোট থেকে টাডেয়াস তীর্থ আধ মাইল দূরে। এই পথটুকু নির্মাণ করা হয়েছে জেরুজালেমের 'ভিয়া ডলোরেসা' বা 'বেদনা-পথের' অনুকরণে। খ্রীষ্টের প্রাণদণ্ডের আদেশ জেরুজালেমের যে-ঘরে হয় সেখান থেকে তাঁর কাঁধে ভারি ক্রস চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাঁকে ক্রসের সঙ্গে পেরেক পুঁতে মারা হয়। এ পথটুকুর নাম 'ভিয়া ডলোরেসা।' ক্যাথলিক মাত্রেরই আশা, জীবনে যেন অন্তত একবার সে ঐ পথ বেয়ে ক্রুসভূমিতে উপস্থিত হতে পারে—যেখানে প্রভু যীশু সর্বযুগের বিশ্বমানবের সর্বপাপ স্কন্ধে নিয়ে কন্টকমুকুটশিরে আপন রক্তমোক্ষণ করে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

কিন্তু জেরুজালেম যাওয়ার সৌভাগ্য বেশি ক্যাথলিকের হবে না বলেই তার অনুকরণে ক্যাথলিক জগতের সর্বত্র 'বেদনা-পথ' বানান হয়। জেরুজালেমে এ পথের যেখানে শুরু তাকে বলা হয় প্রথম স্টেশন (পুণ্যভূমি) আর ক্রুসভূমিতে চতুর্দশ স্টেশন। এখানে তারই অনুকরণে চৌদ্দটি স্টেশনের প্রথমটি হাইস্টারবাখার রোটের কাছে আর শেষটি টাডেয়াস তীর্থের গির্জার ভিতরে।'

চাচা বললেন, 'হাইস্টারবাখার রোটে সেদিন রাইনল্যান্ডের বহু দূরের জায়গা থেকে বিস্তর লোক এসে জড়ো হয়েছে, এখান থেকে পায়ে হেঁটে টাডেয়াস তীর্থে যাবে বলে। ছোট রেস্তোরাঁখানাতে বসবার জায়গা নেই দেখে আমি গাছতলায় বসে পড়েছি—গ্রেটে আর তার মা কোনোগতিকে দুটো চেয়ার পেয়ে বেঁচে গেছে। হঠাৎ দেখি আমাদের পাদ্রীসায়েব গডেসবের্গের যাত্রীদলের তদারক করতে করতে আমার কাছে এসে হাজির। ভদ্রলোক একটু নার্ভাস টাইপের—অর্থাৎ সমস্তক্ষণ হন্তদন্ত, কিছু একটা উনিশ-বিশ হলেই কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যায়।

ধপ করে আমার পাশে বসে পড়লেন। আমি খানিকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলুম, 'এই দুর্বল শরীর নিয়ে গ্রেটের তীর্থযাত্রায় বেরনো কি ঠিক হল?'

পাদ্রীসাহেবের মাথায় ঘাম দেখা দিল। রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, 'জানেন মা-মেরি। গ্রেটের মায়ের শেষ আশা যদি টাডেয়াসের দয়া হয় আর তার বর জোটে। ঐ তো একমাত্র পন্থা পুরোনো প্রেম ভোলবার। তা না হলে ও-মেয়ে তো বাঁচবে না।'

পাদ্রীসায়েব চোখ বন্ধ করে মা-মেরির স্মরণে উপাসনা করলেন, 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী!'

জিরিয়েজুরিয়ে আমরাও শেষটায় রওয়ানা দিলুম তীর্থের দিকে। লম্বা লাইন—সকলের হাতে উপাসনাপুস্তিকা আর জপমালা। পাদ্রীসায়েব চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী'—আর যাত্রীদল বারবার ঘুরে ফিরে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে সর্বশেষে ভক্তিভরে বলে, 'এই পাপীতাপীদের দয়া কর, আর দয়া কর যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।'

তারপর আমরা এক-একটা করে সেই সব স্টেশন (পুণ্যভূমি) পেরোতে লাগলুম। কোনোটাতে পাদ্রীসায়েব চেঁচিয়ে বলেন, 'হে প্রভু, এখানে এসে ক্রসের ভার সইতে না পেরে তুমি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলে,' আর সমস্ত তীর্থযাত্রী করুণকণ্ঠে বলে ওঠে, 'হে প্রভু, তোমার লুটিয়ে পড়াতেই আমাদের পরিত্রাণ হল।' কোনো পুণ্যভূমির সামনে পাদ্রীসায়েব বলেন, 'এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হল তোমার জননী মা-মেরির। দূর থেকে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ। এবার তিনি তোমার কাছে আসতে পেরেছেন কিন্তু কথা কইবার অনুমতি পাননি। তোমার দিকে তিনি তাকালেন—সে তাকানোতে কী পুঞ্জীভূত বেদনা, কী নিদারুণ আতুরতা!' যাত্রীদল এককণ্ঠে বলে উঠল, 'মৃত্যুর চেয়েও ভালবাসা অসীম শক্তির আধার—স্টার্ক্ ভী ডেয়ার টোট্ ইস্ট্ ডী লীবে।' কোনো পুণ্যভূমিতে পাদ্রীসাহেব বলেন, 'এখানে তাপসী ভেরোনিকা তাঁকে বস্ত্রখণ্ড এগিয়ে দিলেন, যীশু মুখ মুছলেন, আর কাপড়ে তাঁর মুখের ছবি ফুটে উঠল।' যাত্রীদল বলে, 'আমাদের হৃদয়ের উপর, হে প্রভু, তুমি সেইরকম ছবি এঁকে দাও।'

যাত্রীদল ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে আ:' প্রতি পুণ্যভূমির সামনে সবাই হাঁটুগেড়ে প্রার্থনা করে। পাদ্রীসায়েব পুণ্যভূমির স্মরণে চিৎকার করে তার বর্ণনা পড়েন, যাত্রীদল নম্রকণ্ঠে সেই ঘটনাকে প্রতীক করে প্রাণের ভিতর তার গভীর অর্থ ভরে নেবার চেষ্টা করে।

বনের ভিতর ঢুকলুম। দু'দিকে উঁচু পাইন গাছ ঠায় দাঁড়িয়ে। আমরা যেন মহাভাগ্যবান নাগরিকদল চলেছি রাজরাজেন্দ্র দর্শনে, আর এরা হতভাগ্যের দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পল্লব দুলিয়ে কপালে করাঘাত করছে, না এরা চামরব্যজন করে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে? প্রার্থনার মৃদু গুঞ্জরণ মিশে গিয়েছে পাইন পল্লবের মর্মরের সঙ্গে, আর জমে-ওঠা শুকনো পাইন পাতার গন্ধ মিশে গিয়েছে যাত্রীদলের হাতের ধূপাধারের গন্ধের সঙ্গে।

খ্রীষ্ট আর মা-মেরির বেদনাকে কেন্দ্র করে এই যাত্রীদল—বিশ্বসংসারের তাবৎ ক্যাথলিক—আপন দুঃখ-কষ্টের সান্ত্বনা খোঁজে, দুর্বলতার আশ্রয় খোঁজে, আপন নির্ভরের

সন্ধান করে। রাধার বিরহবেদনায় বৈষ্ণব সাধু ভগবানকে না-পাওয়ার হাহাকার শুনতে পায়, সুফী সাধকের কান্নার গানও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে প্রিয়াবিরহের বেদনাকে কেন্দ্র করে।'

চাচা বললেন, 'গ্রেটের দিকে আমি মাত্র একবার তাকিয়েছিলুম অতি কষ্টে, সাহস সঞ্চয় করে। দেখি, সে চোখ বন্ধ করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলেছে, তার মা তার হাত ধরে তাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে।'

চাচা বললেন, 'আমার ভক্তি কম। তাই বোধ হয় আড়নয়নে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছিলুম দুপুরবেলাকার সাদা মেঘ অপরাহ্নের শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন কালো কালো ওভারকোট পরতে আরম্ভ করেছে। দশম কি একাদশ পুণ্যভূমির সামনে হঠাৎ জোর হাওয়া বইতে আরম্ভ করল আর সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি—জর্মনে যাকে বলে 'বঙ্কেনব্রুখ' অর্থাৎ মেঘ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। ছাতা-বরসাতি অল্প লোকেই সঙ্গে এনেছিল—এবারে প্রাণ যায় আর কি! ভাগ্যিস সেখান থেকেই তীর্থযাত্রীদের জন্য যে-সব রেস্তোরাঁ তার প্রথমটা অতি কাছে পড়েছিল। তবু রেস্তোরাঁতে গিয়ে যখন ঢুকলুম তখন আমাদের অধিকাংশই জবুথবু। পাদ্রীসায়েব গ্রেটেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন দুখানা বরসাতি দিয়ে। তার মা ছাতা ধরেছিলেন আর পাদ্রীসায়েব গ্রেটেকে বুকের ভিতরে যেন গুঁজে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন। পাদ্রীদের শরীর তাগড়া— যীশু খ্রীষ্টের এত বড় গির্জা যখন তাঁদের কাঁধের উপর থেকে পড়ে ভেঙে যায়নি তখন গ্রেটে তো তার কাছে চরকাকাটা বুড়ির সুতো।

'রথ দেখা আর কলাবেচা' না কচু! তাতে হয় ধর্ম আর অর্থ। কিন্তু যদি বলা হত 'রথ দেখা আর প্রিয়ার কণ্ঠালিঙ্গন' তাহলে হয় ধর্ম আর কাম, আর তাতেই আছে আসল মোক্ষ। রেস্তোরাঁয় ঢুকে তত্ত্বটা মালুম হল।

রেস্তোরাঁ এতই বিশাল যে সেটাকে নৃত্যশালা বলাই উচিত। দেখি শখানেক ছোঁড়াছুঁড়ি, বুড়োবুড়ি ধেইধেই করে নাচছে, বিয়ারের ফোয়ারা বইছে আর শ্যাম্পেনে শ্যাম্পেনে ছয়লাপ। আর সবাই তখন এমনই মৌজে যে আমাদের দল ভিজে কাকের মতো ঢুকতেই চিৎকার করে সবাই অভিনন্দন জানাল। ধাক্কাধাক্কি ঠাসাঠাসি করে আমাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হল, গায়ে পড়ে আমাদের জন্য পানীয় কেনা হল, আহা, আমরা যেন সব লঙ্ লস্ট ব্রাদার্স—বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরে-পাওয়া ভাই।

এতে চটবার কী আছে, বল? ধর্মকর্ম করতে গেলেই যে মুখ গুমশো করে সব কিছু করতে হবে সে কথা লেখে ধর্মবিধির কোন ধারায়? এমনকি আদালতেও দেখোনি যেখানে খুনের মোকদ্দমা হচ্ছে সেখানেও জজ-ব্যারিস্টাররা ঠাট্টামস্করা করেন?

গ্রেটের মা, গ্রেটে, পাদ্রীসায়েব আর আমি একখানা টেবিল পেয়ে গেলুম জানলার

কাছে। বাইরে তখন বৃষ্টি আর ঝড়, আর জানলার খড়খড়ানি থেকে বুঝতে পারছি ঝড় বেড়েই যাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোতে দেখলুম রাস্তা জনমানবহীন, এক হাঁটু জল জমে গিয়েছে।

তাতে কার কী এসে যায়? গান-ফুর্তি তো চলছে। 'ট্রিঙ্ক, ট্রিঙ্ক, ট্রিঙ্ক ক্র্যডারলাইন—পিয়ো, পিয়ো বঁধুয়া, পিয়ো আরবার' শতকণ্ঠে গান উঠছে, পিয়ো পিয়ো বঁধুয়া। এরা সব গান গাইতে পারে ভালো—গির্জেয় এদের ধর্মসঙ্গীত গাওয়ার অভ্যাস আছে। যে শিবলিঙ্গ পুজোর জন্য দেবতা হন তাঁকে দিয়ে মশারির পেরেক ঠুকলে তিনি কি আর গোঁসা করে বাড়িঘরদোর পুড়িয়ে দেন? রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, আমাদেরই বাগানের ফুল 'কেহ দেয় দেবতারে, কেহ প্রিয়জনে।' দুজনকে দিতেও তিনি আপত্তি করতেন না নিশ্চয়ই।

পাদ্রীসায়েব আমাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যেতে লাগলেন। আমাদের তিনমাসের পরিচয়ের মধ্যে একদিন একবারের তরেও তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল দেখাননি। আজ এই শরাবখানায় হঠাৎ যে কেন তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা বেড়ে গেল বুঝতে পারলুম। দরদী মানুষ, গ্রেটের মন ভোলাবার জন্য সব কিছু করতেই রাজি আছেন। আমিও কলকাতাতে যে হাতি-ট্যাক্সি পাওয়া যায় এবং তার ভাড়া দিতে হয় হাতিকে কলা খাইয়ে, সে-কথা বলতে ভুললুম না। বোধ করি গ্রেটেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার সম্মান রাখার জন্য দুএকবার হেসেছিল। একবার আমায় জিজ্ঞেসও করল আমি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কী কী পড়েছি। আমি অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলুম সে কিছু পড়েছে কিনা। ততক্ষণে তার মন আবার অন্য কোন দিকে চলে গিয়েছে। দু'বার জিজ্ঞেস করার পর শুধু বলল 'হুঁ'। বুঝলুম হতভাগিনী শান্তির সন্ধানে অনেক দুয়ারেই মাথা কুটেছে।

সেখানেই ডিনার খাওয়া হল। এ জলঝড়ে তীর্থ মাথায় থাকুন, বাড়ি ফেরার কথাই কেউ তুললো না। শেষ ট্রাম ছাড়ে দশটায়। রাত তখন এগারোটা।

হঠাৎ গ্রেটে পাদ্রীসায়েবকে শুধাল, 'ক'টা বেজেছে?'

পাদ্রীসায়েব একেই নার্ভাস লোক, তার উপর এই জলঝড়ে তাঁর সব কিছু ঘুলিয়ে গিয়েছিল। দশ মিনিট পর পর জানলা দিয়ে দেখছিলেন বৃষ্টি কমবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা—আমি প্রতিবারেই ভেবেছি তীর্থযাত্রীর শেষরক্ষা করার জন্য সায়েবের এই ছটফটানি।

গ্রেটের প্রশ্ন শুনে তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে দরজা খুলে সেই ঝড়ের মাঝখানে বেরিয়ে পড়লেন। আমি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের আলোকে দেখলুম, বাতাসের ঠেলায় পাইন গাছগুলো কাত হয়ে এ ওর গায়ে মাথা কুটছে, আর পাদ্রীসায়েব কোমরে

দুভাঁজ হয়ে কোনো অজানার সন্ধানে চলেছেন।

আমি ফের টেবিলে এসে বসলুম। মা-মেয়ে দুজনই চুপ। আমার মুখ দিয়েও কোনো কথা বেরুচ্ছিল না।

এ ভাবে কতক্ষণ কাটল জানিনে। ঘন্টাখানেক হতে পারে—অল্পবিস্তর এদিক-ওদিক। পাদ্রীসায়েব ফিরে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ের একটি লোম পর্যন্ত শুকনো নয়। বললেন, 'জলঝড়ের জন্য কাউকে খুঁজে পেলুম না, গির্জে বন্ধ করে সবাই চলে গিয়েছে। আর এ জলে তুমি যেতেই বা কী করে?'

পাদ্রীসায়েব আরো কী যেন বলছিলেন, টাডেয়াসকে সব জায়গা থেকেই স্মরণ করা যায়, তিনি অন্তর্যামী—এরকম ধারা কিছু, কিন্তু তাঁর কথার মাঝখানে হঠাৎ গ্রেটে উঠে দাঁড়াল। জলঝড়ের ভিতর দিয়েও শব্দ এল গির্জার বারোটার ঘন্টার। গ্রেটে শুনতে পেয়েছে, মন দিয়ে গুনেছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, তোমাকে তখনই বলেছিলুম, আমি আসব না। তবু তুমি আমায় জোর করে নিয়ে এলে। ঐ শুনলে বারোটা বাজার ঘন্টা ? পরব শেষ হল। য়ুডাস টাডেয়াস আমাকে তাঁর তীর্থে যেতে দিলেন না। তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি জানতুম, আমি জানতুম, এ রকমই হবে। এখন আমি কোথায় যাবো গো, মাগো, হে মা-মেরি—'

গ্রেটের গলা থেকে ঘড়ঘড় করে কী রকম একটা অদ্ভুত শব্দ বেরোল। পাদ্রীসায়েব জড়িয়ে না ধরলে সে পড়ে যেত।'

চাচা থামলে পর অনেকক্ষণ ধরে কেউ কিছু বলল না। শেষটায় বয়সে সকলের ছোট গোলাম মৌলা জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটার আর কোনো খবর নেননি?'

চাচা বললেন, 'না, তবে মাস দুই পরে আরেকদিন গির্জায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি গ্রেটের মা। পরনে কালো পোষাক।'

বেলতলাতে দু-দুবার

বার্লিন শহরে 'হিন্দুস্থান হৌসের' আড্ডা সেদিন জমিজমি করেও জমছিল না। নাৎসিদের প্রতাপ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। আড্ডার তাতে কোনো আপত্তি নেই, বরঞ্চ খুশি হবারই কথা। নাৎসিরা যদি একদিন ইংরেজের পিঠে দু-চার ঘা লাগাতে পারে তাতে অন্তত এ-আড্ডার কেউ বেজার হবে না। বেদনাটা সেখানে নয়, বেদনাটা হচ্ছে দু-একটা মূর্খ নাৎসিকে নিয়ে। ফর্সা ভারতীয়কে তারা মাঝে মাঝে ইহুদি ভেবে কড়া কথা বলে, আর এক নাক-বাঁকা নীল-চোখো কাশ্মীরীকে তারা নাকি দু-একটা ঘুষিঘাষাও মেরেছে।

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা এ-সব বাবদে নাৎসিদের চেয়েও অসহিষ্ণু। বলল, 'আমরা যে পরাধীন সে-কথা সবাই জানে। তবে কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া? এক ব্যাটা নাৎসি সেদিন আমার সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে চটেমটে বলল, "তোমরা তো পরাধীন, তোমরা এসব নিয়ে ফপরদালালি কর কেন?" নাৎসিদের তর্ক করার কায়দা অদ্ভুত।'

পুলিন সরকার বলল, 'তা তুই বললি না কেন, পরাধীন বলেই তো বাওয়া ভারতবর্ষে কলকব্জা বেচে আর ইনশিওরেন্স কোম্পানি খুলে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছো। ভারতবর্ষের লোক তো আর হটেনটট নয় যে স্বরাজ পেলেও কলকব্জা বানাতে পারবে না! জানিস, সুইটজারল্যান্ডে এখনও জাপানী ঘড়ি বিককিরি হয়।'

বিয়ারের ভিতর থেকে সূয্যি রায় বললেন,

'নাই তাই খাচ্ছো,
থাকলে কোথা পেতে?
কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে।'

কাটা-ন্যাজের ঘা'তে যে মাছিগুলো পেট ভরে খেয়ে নিচ্ছিল তারাও তাই নিয়ে গরুটাকে কটুকাটব্য করেনি। নাৎসিদের বুদ্ধি ঐ রকমেরই। যে হাত খাবার দিচ্ছে সেইটেকেই কামড়ায়। নাৎসিদের তুলনায় ইংরেজ সম্বন্ধীরা ঘুঘু—ভারতবর্ষের পরাধীনতাটার সঙ্গে ব্যবহার করে যেন বাড়ির ছোট বউ। মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেয়

বটে, কিন্তু তিনি যে আছেন সে-কথাটা কথাবার্তায় চালচলনে আকছারই অস্বীকার করে যায়।'

চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। তাঁর ন্যাওটা ভক্ত গোঁসাই জিজ্ঞেস করল, 'চাচা যে রা কাড়ছেন না?'

চাচা চোখ না খুলেই বললেন, 'আমি ওসবেতে নেই। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।'

সবাই অবাক। গোঁসাই জিজ্ঞেস করল, 'সে কী কথা? নাৎসিরা তো দাবড়াতে আরম্ভ করেছে মাত্র সেদিন। এর মাঝে কিছু একটা হলে তো আমরা খবর পেতুম।'

কথাটা সত্য। চাচার গলাবন্ধ কোট, শ্যামবর্ণ চেহারা, আর রবিঠাকুরী বাবরী বার্লিন শহরের হাইকোর্ট। যে দেখেনি তার বাড়ি পদ্মার হে-পারে। চাচার উপর চোটপাট হলে একটা 'আন্তর্জাতিক' না হোক 'আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি' হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

চাচা বললেন, 'তোরা তো দেখছিস নাৎসিদের দ্বিজত্ব। তাদের পয়লা জনম হয়েছিল মিউনিকে। আমি তখন—'

জব্বলপুরের শ্রীধর মুখুয্যে অভিমানভরে বলল, 'চাচা, আপনি কি আমাদের এতই বাঙাল ঠাওরালেন যে আমরা পুচ্‌শের (Putsch) খবরটা পর্যন্ত জানিনে?'

চাচা বললেন, 'এহ্ বাহ্য, আমি তারও আগেকার কথা বলছি। এই ভুশুণ্ডি সূয্যি রায় আর আমি তখন মিউনিকে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতুম। মিউনিক বললে ঠিক কথা বলা হল না। আমরা থাকতুম মিউনিক থেকে মাইল পনরো দূরে, ছোট্ট একটা গ্রামে—ডেলি-প্যাসেঞ্জরি করলে সব দেশেই পয়সা বাঁচে। আমি থাকতুম এক মুদির বাড়িতে। নিচের তলায় দোকান, উপরে তিন ছেলে, এক মেয়ে, আর আমাকে নিয়ে মুদির সংসার।

মুদির সংসারটির দুটি মহৎ গুণ ছিল—কাচ্চা-বাচ্চা-বাপ-মা সকলেরই ঠাট্টা-মস্করার রসবোধ ছিল প্রচুর আর ওস্তাদী সঙ্গীতের নামে তারা অজ্ঞান। বড় ছেলে অস্কার বাজাতো বেয়ালা, মেয়ে করতাল-ঢোল, বাপ পিয়ানো আর মেজো ছেলে হুবের্ট চেল্লো। কাজকর্ম সেরে দু'দণ্ড ফুরসৎ পেলেই কনসার্ট—কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঠাট্টা-মস্করা।

কিন্তু এদের মধ্যে আসল গুণী ছিল অস্কার। তবে তার গুণের সন্ধান পেতে আমার বেশ কিছুদিন লেগে গিয়েছিল—কারণ অস্কারকে পাওয়া যেত দুই অবস্থায়। হয় টং মাতাল, নয় মাথায় ভিজে পট্টি বাঁধা। তখন সে প্রধানত আমাকে লক্ষ্য করেই বলত, 'ডু ইন্ডার, ওরে ভারতবাসী কালা শয়তান, তোরা যে মদ খাসনে সেইটেই তোদের একমাত্র গুণ। তোর সঙ্গে থেকে থেকে আর কাল রাত্রির বাইশ গেলাশের পর—'

মেয়ে মারিয়া আমাকে বলল, 'বাইশ না বিয়াল্লিশ জানল কী করে? পনরোর পর তো ও আর হিসেব রাখতে পারে না।'

মা বলল, 'তাই হবে। কাল রাত্রে চারটের সময় অস্কার বাড়ি ফিরে তো হুড়হুড় করে

সব বিয়ার গলাতে আঙুল দিয়ে বের করে দিচ্ছিল। বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল মদওয়ালা যে বাইশ গ্লাসের দাম নিল তাতে কোনো ফাঁকি নেই তো! বমি করছিল বোধহয় মেপে দেখবার জন্য।'

অস্কার বলল, 'ওসব কথায় কান দিয়ো না হে ইন্ডার (ভারতীয়)। দরকারও আর নেই। আমি এই সর্বজনসমক্ষে মা-মেরির দিব্যি কেটে বললুম, আর ককখনো মদ স্পর্শ করব না। মদ মানুষকে পরের দিন কী রকম বেকাবু করে ফেলে এই ভিজে পট্টিই তার লেবেল। বাপ রে বাপ, মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে!'

ভিজে পট্টিতেও আর কুলোল না। অস্কার কল খুলে মাথাটি নিচে ধরল।

সেখান থেকেই জলের শব্দ ডুবিয়ে অস্কার হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমাকে বিয়ারে ফাঁকি দিয়ে পয়সা মারবে কে শুনি? হুঁঃ! বক্সিং-এর পয়লা প্রাইজের কথা কি মদওয়ালা ভুলে গিয়েছে? তার হোটেলের বাগানেই তো বাবা ফাইনালটা হলো। ব্যাটার নাকটা এমনিতেই থ্যাবড়া, আমার বাঁ হাতের একখানা সরেস আন্ডার-কাট খেলে সে-নাক মিউনিক-বার্লিন সদর রাস্তার মতো ফেলেট্ হয়ে যাবে না?'

কথাটা ঠিক। বিয়ারওয়ালা বরঞ্চ ইনকাম-টেক্স অফিসারকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে পাবে—'আভে মারিয়া' মন্ত্র কমিয়েসমিয়ে ভগবানকে ফাঁকি প্রতি রবিবারে গির্জেঘরে সে দেয়ই, না হলে সময়মতো দোকান খুলবে কী করে—কিন্তু বিয়ার নিয়ে অস্কারের সঙ্গে মস্করা ফস করে কেউ করতে যাবে না।

ঢকঢক করে এক গেলাশ নেবুর সরবৎ খেয়ে অস্কার বলল, 'মাথার ভিতর যেন এ্যারোপ্লেনের প্রপেলার চলছে, চোখের সামনে দেখছি গোলাপি হাতি সারে সারে চলেছে, জিবখানা যেন তালুর সঙ্গে ইস্ক্রু মারা হয়ে গিয়েছে, কানে শুনছি মা যেন বাবাকে ঠ্যাঙাচ্ছে।'

মুদি বলল, 'ভালো হোক মন্দ হোক, আমার তো একটা আছে, তুই তো তাও জোটাতে পারলিনে।'

অস্কার কান না দিয়ে বলল, 'কিন্তু আর বিয়ার না। মা-মেরি সাক্ষী, পীর রেমিগিয়ুস সাক্ষী, কালা শয়তান ইন্ডার সাক্ষী, আর বিয়ার না।'

অস্কারকে সকালবেলা যে কোনো মদ্য-নিবারণী সভার বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া যায়। সন্ধ্যের সময় বিয়ারের জন্য সে আল কাপোনের ডাকাতদলের সর্দারী করতে প্রস্তুত। আমি পকেট-ডায়েরি খুলে পড়ে বললুম, 'অস্কার, এই নিয়ে তুমি সাতাশীবার মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করেছ।'

অস্কার বলল, 'যাঃ! তুই সাতাশী পর্যন্ত গুনতেই পারিসনে। ভারতবর্ষে অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা সাতাশী। তুই তো তাদেরি একজন। ওখানে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে

দিয়েছে বলেই তো এদেশে এসেছিস। দুই সাতাশীতে ঘুলিয়ে ফেলেছিস।'

মুদির মা বলল, 'অস্কার চাকরি পেয়েছে আঠারো বছর বয়সে। সেই থেকে প্রতি রাত্রেই বিয়ার, ফি সকাল মদ ছাড়ার শপথ। এখন তার বয়স বাইশ। সাতাশীবার ভুল বলা হল।'

অস্কার বলল, 'ঐ যাঃ! বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম, আজ আমাদের কারখানার সালতামামী পরব—বিয়ার পার্টি। চাকরির কথায় মনে পড়ল। কিন্তু না, না, না, আর বিয়ার না। দেখো, ইন্ডার, আজ যদি পার্টির কোনো ব্যাটা আসে তবে তুমি ভারতীয় কায়দা?! তাকে নরবলি দেবে।''

চাচা বললেন, 'আমি আজও বুঝতে পারিনে অস্কার এই পট্টিবাঁধা মাথা নিয়ে কী করে প্রেসিশন মেশিনারির কাজ করত। মদ খেলে তো লোকের হাত কাঁপে, চোখের সামনে গোলাপি হাতি দেখে। অস্কার এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ তা হলে দেখতই বা কী করে আর বানাতোই বা কী কৌশলে? এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারত বলে তাকে মাত্র দু'ঘন্টা কারখানায় খাটতে হত। মাইনেও পেত কয়েক তাড়া নোট। তাই দিয়ে খেত বিয়ার আর করত দান-খয়রাত। দ্বিতীয়টা হরবকত। মৌজে থাকলে তো কথাই নেই, পট্টিবাঁধা অবস্থায় ও মোটর-সাইকেল থেকে নেবে বুড়ি দেশলাইওয়ালীর কাছ থেকে একটা দেশলাই কিনে এক ডজনের পয়সা দিত।

অস্কার ছিল পাঁড় নাৎসি। আমাকে বলত, 'এ সব ভিখিরি আতুরকে কেন যে সরকার গুলি করে মারে না একথাটা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারিনে। সমস্ত দেশের কপালে আছে তো কুল্লে তিন মুঠো গম। তারই অর্ধেক খেয়ে ফেললে এ বুড়ি, ও কানী, সে খোঁড়া। সোমত্থ জোয়ানরা খাবে কী, দেশ গড়বে কী দিয়ে? শ্লেজকে যখন নেকড়ে তাড়া করে তখন দুটো দুবলা বাচ্চা ফেলে দিয়ে বাঁচাতে হয় তিনটে তাগড়াকে। সব কটাকে বাঁচাতে গেলে একটাকেও বাঁচানো যায় না। কথাটা এত সোজা যে কেউ স্বীকার করবে না, পাছে লোকে ভাবে লোকটা যখন এত সোজা কথা কয় তখন সে নিশ্চয়ই হাবা।'

আমি বললুম, 'তিনটেকে বাঁচাতে গিয়ে দুটোকে নেকড়ের মুখে দিয়ে যদি অমানুষ হতে হয় তবে নাই বাঁচল একটাও।'

অস্কার যেন ভয়ঙ্কর বেদনা পেয়েছে সে রকম মুখ করে বললে, 'বললি? তুইও বললি? তুই না এসেছিস এদেশে পড়াশোনা করতে! এদেশের পণ্ডিতদের জুড়ি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই বলেই তুই এখানে এসেছিস। এ পণ্ডিতের জাতটা মরে যাক এই বুঝি তোর ইচ্ছে? বল দিকিনি বুকে হাত দিয়ে, এই জর্মন জাতটা মরে গেলে পৃথিবীটা চালাবে কে? পণ্ডিত, কবি, বীর এ জাতে যেমন জন্মেছে—'

আমি বললুম, 'থাক থাক। তোমার ওসব লেকচার আমি ঢের ঢের শুনেছি।'

অস্কার মোটর-সাইকেল থামিয়ে বলল, 'যা বলেছিস। তোকে এসব শুনিয়ে কোনো লাভ নেই। তুই মুসলমান, তোরা কখনো ধর্ম বদলাসনে, যা আছে তাই নিয়ে আঁকড়ে পড়ে থাকিস। চ, একটা বিয়ার খাবি?'

আমি পিনিয়ন থেকে নেমে বললুম, 'গুড বাই। আর দেখো, তুমি সোজা বাড়ি যেয়ো। আমি লোকাল ধরব।'

অস্কার বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমাকে তো আর নিত্যি নিত্যি আমি লিফট দিতে পারিনে। কারখানায় পরীরা সব ভয়ঙ্কর চটে গিয়েছে আমার উপর, কাউকে লিফট দিইনে বলে। প্রেমট্রেম সব বন্ধ।'

আমি রাগ করে বললুম, 'এ কথাটা এত দিন বলোনি কেন? আমি তোমাকে পই-পই করে বারণ করিনি আমার কখন ক্লাস শেষ হয় না হয় তার ঠিক নেই, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে না।'

অস্কার বলল, 'তোমার জন্য আমি আর অপেক্ষা করলুম কবে? সামনের শরাবখানায় ঢুকি এক গেলাস বিয়ারের তরে। জানলা দিয়ে যদি দেখা যায় তুমি বেরিয়ে আসছ তাহলে কি তোমার দিকে তাকানোটাও বারণ? বেড়ালটাও তো কাইজারের দিকে তাকায়, তাই বলে কি কাইজার তার গর্দান নেন নাকি?''

চাচা বললেন, 'অস্কারের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আর ঐ ছিল তার অদ্ভুত পরোপকার করার পদ্ধতি। 'ভিখিরিটাকে তিনটে মার্ক দিলে কেন?' অস্কার বলবে, 'ব্যাটা বেহেড মাতাল, তিন মার্কে টং নেশা করে গাড়ি চাপা হয়ে মরবে এই আশায়।' 'আমাকে নিত্যি নিত্যি লিফট দেবার জন্য তুমি অপেক্ষা করো কেন?' 'সে কি কথা? আমি তো বিয়ার খেতে শরাবখানায় ঢুকেছিলুম!' 'নাৎসি পার্টিতে টাকা ঢালছো কেন?' 'তাই দিয়ে বন্দুক-পিস্তল কিনে বিদ্রোহ করবে, তারপর ফাঁসিতে ঝুলবে বলে।' আমি একদিন বলেছিলুম, 'মিশনরিরা যে আফ্রিকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে যায় সেটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।' অস্কার বলল, 'তাহলে দুর্ভিক্ষের সময় বেচারী নিগ্রোরা খাবে কী? মিশনরির মাংস উপাদেয় খাদ্য!''

চাচা বললেন, 'কিন্তু এসব হাইজাম্প-লঙজাম্প শুধু মুখে মুখে। অস্কার নাৎসি আন্দোলনের বেশ বড় ধরনের কর্তা আর নাৎসিদের নিয়ে নিজে যতই রসিকতা করুক না কেন, আর কেউ কিছু বললে তাকে মার-মার করে তাড়া লাগাত। আমার সঙ্গে এক বৎসর ধরে যে এত বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল সেইটি পর্যন্ত সে একদিন অকাতরে বিসর্জন দিল ঐ নাৎসিদের সম্বন্ধে আমি আমার রায় জাহির করেছিলুম বলে।

রান্নাঘরে সকালবেলা সবাই জমায়েত। সেদিন ছিল রবিবার—সপ্তাহে ঐ একটিমাত্র

দিন আমরা সবাই রান্নাঘরে বসে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতুম, আর ছ'দিন যে যার সুবিধে মতো।

মেয়ে মারিয়া পাঁচজনের উপকারার্থে চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। অস্কার মাথায় ভিজে পট্টি বাঁধছিল আর আপনমনে মাথা নেড়ে নেড়ে নিজেকে বোঝাচ্ছিল, বিয়ার খাওয়া বড় খারাপ। মারিয়া হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ খবরটা মন দিয়ে শুনুন, হের ডক্টর। —পাটেনকির্ষেনে হৈ হৈ রৈ রৈ, নাৎসি গুণ্ডা কর্তৃক ইহুদিনী আক্রান্ত। প্রকাশ, ইহুদিনী রাস্তায় নাৎসি পতাকা দেখে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আপন বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। নাৎসিরা তখন তাকে ধরে নিয়ে এসে পতাকার সামনে মাথা নিচু করতে আদেশ করে। সে তখনো নারাজি প্রকাশ করাতে নাৎসিরা তাকে মার লাগায়। পুলিশ এসে পড়ায় নাৎসিরা পালিয়ে যায়। তদন্ত চলছে।''

চাচা বললেন, 'আমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললুম, নাৎসি গুণ্ডারা কী করে না-করে আমার তাতে কী?'

অস্কার আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'জাতির পতাকার সম্মান যারা বাঁচাতে চায় তারা গুণ্ডা?'

আমি কিছু বলার আগেই বুড়ো বাপ বলল, 'ওটা জাতির পতাকা হল কী করে? ওটা তো নাৎসি পার্টির পতাকা।'

আমি বললুম, 'ঠিক, এবং জাতীয় পতাকাকে কেউ অবহেলা করলে তাকে সাজা দেবার জন্য পুলিশ রয়েছে, আইন-আদালত রয়েছে। বিশেষ করে একটা মেয়েকে ধরে যখন পাঁচটা ষাঁড়ে মিলে ঠ্যাঙায় তখন সেটা গুণ্ডামি না হলে গুণ্ডামি আর কাকে বলে?'

অস্কার আমার দিকে ঘুরে হঠাৎ 'আপনি' বলে সম্বোধন করে বলল, 'আপনি তা হলে ইহুদিদের পক্ষে?'

আমি বললুম, 'অস্কার অত সিরিয়স হচ্ছ কেন? আমি ইহুদিদের পক্ষে না বিপক্ষে সে প্রশ্ন তো অবান্তর।'

অস্কার বলল, 'প্রশ্নটা মোটেই অবান্তর নয়। ইহুদিরা যতদিন এদেশে থাকবে ততদিনই বর্ণসঙ্করের সম্ভাবনা থাকবে। জর্মনির নর্ডিক জাতের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।''

চাচা বললেন, 'এর পর আমার আর কোনো কথা না বললেও চলত। কিন্তু মানুষ তো আর সবসময় শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে ওঠা-বসা করে না, আর হয়তো অস্কার আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যে আমার মনে হয়েছিল, কোনো একটা যুৎসই উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। আমি বললুম, 'ভারতবর্ষেও তো আর্য জাতি রয়েছে এবং তারা জর্মনদের চেয়ে ঢের বেশি খানদানী এবং কুলীন। আর্যদের প্রাচীনতম সৃষ্টি চতুর্বেদ ভারতবর্ষেই বেঁচে আছে। গ্রীস রোমে যা আছে তার বয়স বেদের হাঁটুর বয়সেরও কম।

জর্মনির-ফ্রান্সের তো কথাই ওঠে না—পরশু দিনের সব চ্যাংড়ার পাল। কিন্তু তার চেয়েও বড় তত্ত্বকথা হচ্ছে এই, ভারতবর্ষের যা কিছু প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে তোমরা-আমরা সবাই গর্ব করি সেটা গড়ে উঠেছে আর্য-অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণ অর্থাৎ বর্ণসঙ্করের ফলে। আমাদের দেশে বর্ণসঙ্কর সবচেয়ে কম হয়েছে কাশ্মীরে—আর ভারতীয় সভ্যতায় কাশ্মীরীদের দান ট্যাকে গুঁজে রাখা যায়। এবং আমার বিশ্বাস যে সব গুণী জর্মনিকে বড় করে তুলেছেন তাঁদের অনেকেই খাঁটি আর্য নন।'

আমাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে অস্কার হুঙ্কার তুলে বলল, 'আপনি বলতে চান, আমাদের সুপারম্যানরা সব বাস্টার্ড?''

চাচা বললেন, 'আমি তো অবাক। কিন্তু ততক্ষণে আমার সৎবুদ্ধির উদয় হয়েছে। কিছু না বলে চুপ করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন। সেই অবসরে গোলাম মৌলা বলল, 'আমার সঙ্গেও ঠিক এইরকম ধারাই তর্ক হয়েছিল। কিন্তু আমি তো ভারতীয় সভ্যতার অতশত জানিনে, তাই ওরকম টায়টায় তুলনা দিয়ে তর্ক করতে পারিনি। কিন্তু নাৎসিরা রাগ দেখায় একই ধরনের।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী প্রয়োজন ছিল তর্ক করার? বিশেষ করে যখন জানি, যত বড় সত্য কথাই হোক মানুষ আপন কৌলীন্য বজায় রাখার জন্য সেটাকেও বিসর্জন দেয়। তার উপর অস্কার জানেই বা কী, বোঝেই বা কী? মানুষটা ভালো, তর্ক করে আনাড়ির মতো, আর আগেও তো বলেছি তার হাইজাম্প-লঙজাম্প তো শুধু মুখেই।

আমি আর অস্কার বাড়ির সক্কলের পয়লা ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরতুম। পরদিন খেতে বসে দেখি অস্কার নেই। র‍্যাকে তার বরসাতি আর হ্যাটও নেই। বুঝলুম আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। মনে কী রকম খটকা লাগল। দুদিনের ভিতরই কিন্তু ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল—অস্কার আমাকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শুনলুম মুদি আর তার মা আমার পক্ষ নিয়ে অস্কারকে ধমক দিয়েছেন। অস্কার কোনো উত্তর দেয়নি, কিন্তু আমি রান্নাঘরে থাকলে সেখানে আসে না।

মহা বিপদগ্রস্ত হলুম। বাড়ির বড় ছেলে আমার সঙ্গে মন কষাকষি করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, আর-সবাই সে সম্বন্ধে সচেতন, অষ্টপ্রহর অস্বস্তিভাব, বুড়োবুড়ি আমার দিকে সব সময় কী রকম যেন মাপ-চাই ভাবে তাকান—মরুক গে, কী হবে এখানে থেকে!

বুড়োবুড়ি তো কেঁদেই ফেললেন। মারিয়া আমার কাছে ইংরিজি পড়ত। সে দেখি জিনিসপত্র প্যাক করছে। বলল, 'চললুম কিছুদিনের জন্য মাসির বাড়ি।' দুসরা ছেলে

হুবের্টও কথা কইত কম। আমাকে ম্যুনিকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় বলল, 'আশ্চর্য, অস্কারের মতো সহৃদয় লোক নাৎসিদের পাল্লায় পড়ে কী রকম অদ্ভুত হয়ে গেল দেখলেন?' আমি আর কী বলব।'

চাচা বললেন, 'তারপর ছমাস কেটে গিয়েছে। বান্ধব বর্জন সব সময়ই পীড়াদায়ক— সে বর্জন ইচ্ছায় করো আর অনিচ্ছায়ই ঘটুক। তার উপর বড় শহরে মানুষ যে রকম নিঃসঙ্গ অনুভব করে তার সঙ্গে গ্রামের নির্জনতার তুলনা হয় না। গ্রামের নিত্যিকার ডালভাত অরুচি এনে দেয় সত্যি, তবু সেটা শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর পাঁচজনের শেরি-শ্যাম্পেন খাওয়া দেখার চেয়ে অনেক ভালো। দিনের ভিতর তাই অন্তত পঞ্চাশবার 'দুত্তোর ছাই' বলতুম, আর বুড়োবুড়ির কাছে ফিরে যাওয়া যায় কি না ভাবতুম। কিন্তু জানো তো, বড় শহরে স্থান যোগাড় করা যেমন কঠিন, সেখান থেকে বেরনো তার চেয়েও কঠিন।

করে করে প্রায় এক বৎসর কেটে গিয়েছে। একদিন বাসায় ফিরে দেখি বুড়োবুড়ি আর মারিয়া আমার বসার ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কী ব্যাপার? র্যোনডর্ফের সাম্বৎসরিক মেলা। আমাদের যেমন ঈদ-দুর্গোৎসবের সময় আত্মীয়স্বজন দেশের বাড়িতে জড়ো হয় এদের বাৎসরিক মেলার সময়ও ঐ রেওয়াজ। বুড়োবুড়ি, মারিয়া তাই আমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন।

আমার মনের ভিতর কী খেলে গেল সেইটে যেন বুঝতে পেরেই মারিয়া বলল,'অস্কারের সঙ্গে এ কদিন আপনার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই বললেও চলে। ছুটি নিয়ে এ কদিন সে অষ্টপ্রহর বিয়ার খায়। আপনাকে দেখলে ও চিনতে পারবে না।'

বুড়ি বললেন, 'অস্কারকে একটা সুযোগ দিন আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার। মেলার সময় তাই তো আত্মীয়স্বজন জড়ো হয়।'

মেলার পরব সব দেশে একই রকম। তিন মিনিট নাগরদোলায় চক্কর খেয়ে নিলে, ঝপ করে দুটো পানের খিলি মুখে পুরলে (দেশভেদে চকলেট), দুটো সস্তা পুতুল কিনলে, গণৎকারের সামনে হাত পাতলে, না হয় ইয়ারদের সঙ্গে গোট পাকিয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসলে (দেশভেদে ফষ্টিনষ্টি করলে)। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে যে ঘন ঘন পট পরিবর্তন সম্ভব হয় না সেইটে মেলার সময় সুদে-আসলে তুলে নেওয়া। যে মেলা যত বেশি মনের ভোল ফেরাবার পাঁচমেশালি দিতে পারে সে মেলার জৌলুশ তত বেশি। তাই বুঝতে পারছ, বড় শহরে কেন মেলা জমে না। যেখানে মানুষ বারো মাস মুখোস পরে থাকে সেখানে বহুরূপী কল্কে পাবে কেন?

তবে দেশের মেলার সঙ্গে এদেশের মেলার একটা বড় তফাত রয়েছে। রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেলা যখন ঝিমিয়ে আসে তখন দেশে শুরু হয় যাত্রা-গান কিম্বা কবির

লড়াই। এদেশে শুরু হয় মদ আর নাচ। ছোটখাটো গ্রামে তো প্রায় অলঙ্ঘ্য রেওয়াজ প্রত্যেক মদের আড্ডায় অন্তত একবার ঢুকে এক গেলাশ বিয়ার খাওয়ার। কারো দোকান কট করা চলবে না, তা ততক্ষণে তুমি টং হয়ে গিয়ে থাকো আর নাই থাকো।

আমরা যেরকম উচ্ছৃঙ্খলতায় সুখ পাই, জর্মনরা তেমনি আইন মেনে সুখ পায়। মুদি-মুদিবউ তাই আমাকে নিয়ে এই নিয়ম প্রতিপালন করে করে শেষটায় ঢুকলেন তাঁদেরই বাড়ির পাশের গ্রামের সব চেয়ে বড় শরাবখানায়। রাত তখন এগারোটা হবে। ডান্স হলের যা সাইজ তাতে দু-পাঁচখানা চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে অনায়াসে লুকোচুরি খেলতে পারে। আশপাশের দশখানা গ্রামের ছোঁড়াছুঁড়ি বুড়োবুড়ি ধেইধেই করে নাচছে, আর শ্যাম্পেন-ওয়াইন যা বইছে তাতে সমস্ত গ্রামখানাকে সম্বৎসর মজিয়ে রেখে আচার বানানো যায়। দেশলাই ঠুকতে ভয় হয় পাছে হাওয়ার অ্যালকহলে আগুন ধরে যায়, সিগার-সিগারেটের ধুঁয়ো দেখে মনে হয়, দেশের গোয়ালঘরের মশা তাড়ানো হচ্ছে।

বুড়োবুড়ি পাড়ার মুরুব্বি। কাজেই তাঁদের জন্য টেবিল রিজার্ভ করা ছিল।

বুড়োবুড়ি আইন মেনে একচক্কর নেচে নিলেন। বয়স হয়েছে, অল্পেই হাঁপিয়ে পড়েন। তবু পায়ের চিকণ কাজ থেকে অনায়াসে বুঝতে পারলুম, এঁদের যৌবনে এঁরা আজকের দিনের ছোঁড়াছুঁড়ির চেয়ে ঢের ভালো নেচেছেন। আর মারিয়ার তো পো' বারো। সুন্দরী মেয়ে। তাকে নিয়ে যে লোফালুফি লেগে যাবে, সে-কথা নাচের মজলিসে না এসেই বলা যায়।

ঘন্টাখানেক কেটে গিয়েছে। মজলিস গুলজার। সবাই মৌজে। তখনো লোকজন আসছে—এত লোকের যে কোথায় জায়গা হচ্ছে খোদায় মালুম, আল্লাই জানেন। এমন সময় একজোড়া কপোত-কপোতী আমাদেরই টেবিলের পাশে এসে জায়গার সন্ধানে চারদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু তখন আর সত্যিই একখানা চেয়ারও খালি নেই। বুড়োবুড়ি তাদের ডেকে বললেন, 'আমরা বাড়ি যাচ্ছি। আপনারা আমাদের জায়গায় বসতে পারেন।' আমি উঠে দাঁড়ালুম। বুড়ি বললেন, 'সে কি কথা? আপনি থাকবেন। না হলে মারিয়াকে বাড়ি নিয়ে আসবে কে?' আমার বাড়ি যাবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এরপর তো আর আপত্তি জানানো যায় না। জর্মনি মধ্যযুগের প্রায় সব বর্বরতা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু শক্তসমর্থ মেয়ের রাত্রে রাস্তায় একা বেরতে নেই এ বর্বরতাটা কেন ছাড়তে পারে না বুঝে ওঠা ভার।

কপোত-কপোতী চেয়ার দুটো পেয়ে বেঁচে গেল। কপোতীটি দেখতে ভালোই, মারিয়ার সঙ্গে বেশ যেন খাপ খেয়ে গেল। আমি তাদের মধ্যিখানে বসেছিলুম—আহা, যেন দুটি গোলাপের মাঝখানে কাঁটাটি।'

চাচার কথায় বাধা দিয়ে গোঁসাই বললেন, 'চাচা, আত্মনিন্দা করবেন না। বরঞ্চ বলুন,

দুটো কাঁটার মাঝখানের গোলাপটি। আর কিছু না হোক, সেই অজ-পাড়াগাঁয়ে ইন্ডার হিসেবে নিশ্চয়ই আপনাকে মাইডিয়ার-মাইডিয়ার দেখাচ্ছিল।'

চাচা বললেন, 'ঠিক ধরেছিস। ঐ বিদেশী চেহারার যে চটক থাকে তাই নিয়ে বাঁধল ফ্যাসাদ।

নাচের মজলিসে, বিশেষ করে একই টেবিলে তো আর ব্যাকরণসম্মত পদ্ধতিতে ইনট্রডাকশন করে দেবার রেওয়াজ নেই। কপোতীটি বিনা আড়ম্বরে শুধালো, 'আপনি কোন দেশের লোক?' উত্তর দিলুম। তারপর এটা ওটা সেটা এমনকি ফষ্টিটা-নষ্টিটা, অবশ্যি সন্তর্পণে, যেন ফুলদানির ফুলের ভিতর দিয়ে— থ্রু দ্য ফ্লাওয়ার্স।

ওদিকে দেখি কপোতটি এ জিনিসটা আদপেই পছন্দ করছে না।

আমি ভাবলুম, কাজ কী হ্যাঙ্গামা বাড়িয়ে। দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দিলুম না, যেন শুনতে পাইনি। কিন্তু মারিয়াটা ঘড়েল মেয়ে। ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে, আর নষ্টামির ভূত চেপেছে তার ঘাড়ে, হয়তো শ্যাম্পেনও তার জন্য খানিকটা দায়ী। সে আরম্ভ করল মেয়েটাকে ওসকাতে। বলল, 'জানেন, ইনি আমার দাদা হন।'

মেয়েটি বলল, 'তা কী করে হয়! ওঁর রঙ বাদামী, চুল কালো, উনি তো ইন্ডার।'

মারিয়া গম্ভীর মুখে বলল, 'ঐ তো! উনি যখন জন্মান, মা-বাবা তখন কলকাতার জর্মন কনসুলেটে কর্ম করতেন। কলকাতার লোক বাঙলা ভাষায় কথা কয়। দাদাকে জিজ্ঞেস করুন উনি বাঙলা জানেন কি না।'

মেয়েটি হেসে কুটিকুটি। বলল, 'হ্যাঁ, ওর জর্মন বলাতে কেমন যেন একটু বিদেশী গোলাপের খুশবাই রয়েছে।' মেরেছে! বিদেশী ওঁচা এ্যাকসেন্ট হয়ে দাঁড়ালো 'গোলাপী খুশবাই'!'

চাচা বললেন, 'আমি মারিয়াকে দিলুম ধমক। দিয়ে করলুম ভুল। বোঝা উচিত ছিল মারিয়ার স্কন্ধে তখন শ্যাম্পেনের ভূত ড্যাংড্যাং করে নাচছে। শ্যাম্পেনকে ঝাঁকুনি দিলে তার বজবজ বাড়ে বই কমে না। মারিয়া মরমিয়া সুরে কপোতীর কাছে মাথা নিয়ে গিয়ে বলল, "আর উনি এ্যাসা খাসা নাচতে পারেন! আমাদেরই ওয়ালট্‌স্ নাচ—আর তার উপর থাকে ভারতীয় জরির কাজ। আইন, ৎসুয়াই, দ্রাই—আইন, ৎসুয়াই, দ্রাই—তার সঙ্গে ধা, ধিন, না; ধা, তিন না; ডাডরা—না?"

চাচা বললেন, 'পাঁচপীরের কসম, আমার বাপ-ঠাকুর্দা চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনো নাচেনি। মুখে গরম আলু পড়াতে হয়তো নেচেছে, কিন্তু সে তো ওয়ালট্‌স্ নয়। মেয়েটাও বেহায়ার একশেষ। মারিয়াকে বলল, 'তা উনি যে নাচতে পারবেন তাতে আর বিচিত্র কী? কী রকম যেন সাপের মতো শরীর।' বলে চোখ দিয়ে যেন আমার গায়ে এক দফা হাত বুলিয়ে নিল।'

চাচা বললেন, 'ওঃ! এখনো ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। ওদিকে ছেলেটাও চটে উঠেছে। আর চটবে নাই বা কেন? বান্ধবীকে নিয়ে এসেছে নাচের মজলিসে ফূর্তি করতে। সে যদি আরেকটা মদ্দার সঙ্গে জমে যায় তবে কার না রাগ হয়? কপোত দেখি বাজপাখির মূর্তি ধরতে আরম্ভ করছে। তখন তাকিয়ে দেখি তার কোটে লাগানো রয়েছে নাৎসি পার্টির মেম্বারশিপের নিশান। ভারি অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলুম।

মারিয়া তখন তার-সপ্তকের পঞ্চমে। শেষ বাণ হানলো, "একটু নাচুন না, হের ডক্টর।"

আমাদের দেশে যেমন বাচ্চা মেয়ের নাম 'পেঁচির মা,' 'ঘেঁচির মা' হয়, আপন বাচ্চা জন্মাবার বহু পূর্বে, ম্যুনিক অঞ্চলে তেমনি ডক্টরেট প্রসব করার পূর্বেই পোয়াতী অবস্থাতেই আত্মীয়স্বজন ডাকতে আরম্ভ করে, 'হের ডক্টর।' আমার তখনো ডক্টরেট পাওয়ার ঢের বাকি, কিন্তু আত্মজনের নেকনজরে আমি য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হার্ড-বয়লড 'হের ডক্টর' হয়ে গিয়েছিলুম। মারিয়ার অবিশ্যি এই বেমোকায় 'হের ডক্টর' বলার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটিকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যে অজ পাড়াগাঁয়ের মেলাতে বসে থাকলেই মানুষ কিছু কামার-চামার হতে বাধ্য নয়—আমি রীতিমত খানদানী মনিষ্যি, 'হের ডক্টর'—বাঙলা কথা।

মেয়েটি তখন কাতর হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে বলল, 'হে— র— ড— ক্— ট্— র!"

চাচা বললেন, 'আমি মনে মনে বললুম দুত্তোর 'হের ডক্টর', আর দুত্তোর এই মারিয়াটা! মুখে বললুম, 'মারিয়া, আমি এখখুনি আসছি।' বলে, দিলুম চম্পট।'

চাচা বললেন, 'তোরা তো ম্যুনিকে যাসনি, কাজেই জানিসনে মানুষ সেখানে কী পরিমাণ বিয়ার খায়। তাই সবাইকে যেতে হয় ঘনঘন বিশেষ স্থলে। আমি এসব জিনিস খাইনে, কিন্তু তাই নিয়ে তো মারিয়া আর তর্কাতর্কি জুড়তে পারে না।'

চাচা বললেন, 'বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কষে ঠাণ্ডা বাতাস বুকের ভিতর নিয়ে সিগার-সিগরেটের ধুঁয়ো যতটা পারি ঝেঁটিয়ে বের করলুম। মারিয়াটা যে এত মিটমিটে শয়তান কী করে জানব বল। কিন্তু মারিয়ার কথায় মনে পড়ল, ওকে ফেলে তো বাড়ি যাওয়া যাবে না। বুড়োবুড়ি তাহলে সত্যিই দুঃখিত হবেন। ভাববেন, এই সামান্য দায়টুকু আমি এড়িয়ে গেলুম। কিন্তু ততক্ষণে একটা দাওয়াই বের করে ফেলেছি। শরাবখানার ঠিক মুখোমুখি ছিল আরেকটি ছোটা সে ছোটা বিয়ার ঘর। সেখানে কফিও পাওয়া যায়। অধিকাংশ খদ্দের ওখানে ঢুকে 'বারে' দাঁড়িয়েই ঝপ করে একটা বিয়ার খেয়ে চলে যায়, আর যারা নিতান্ত নিরামিষ তারা বসে বসে কফিতে চুমুক দেয়। স্থির করলুম, সেখানে বসে কফি খাব, আর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে নজর রাখব। যদি

মারিয়া বেরোয় তবে তক্ষুণি তাকে ক্যাঁক করে ধরে বাড়ি নিয়ে যাব। যদি না বেরোয় তবে ঘন্টাখানেক বাদে মারিয়ার তত্ত্বতালাশ করব। শ্যেনও ততক্ষণে ফের কবুতর হয়ে যাবে আশা করাটা অন্যায় নয়।'

চাচা শিউরে উঠে বললেন, 'বাপস! কী মারাত্মক ভুলই না করেছিলুম সেই বিয়ার-খানায় ঢুকে। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে দেখি সেই কপোতী শরাবখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর ঢুকল সেই বিয়ারখানাতে। আমার তখন আর লুকোবার বা পালাবার পথ নেই। আমাকে দেখে মেয়েটির মুখে বিদ্যুৎ-চমকানো-গোছ হাসি ঝিলিক মেরে উঠল। ঝুপ করে পাশের চেয়ারে বসে বলল, 'একটু দেরি হলো। কিছু মনে করোনি তো ?' বলে, দিল আমার হাতে হাত, পায়রার বাচ্চা যে রকম মায়ের বুকে মুখ গোঁজে।

বলে কী! ছন্ন না মাথা খারাপ? আপন মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝলুম, এরকম ধারা চলে এসে অন্য জায়গায় বসাটা হচ্ছে এদেশের প্রচলিত সঙ্কেত। অর্থটা 'সপত্ন (অর্থাৎ পুং-সতীন) ব্যাটাকে এড়িয়ে চলে এস বাইরে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' তাই সে এসেছে।

মেয়েটা আমার হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'কিন্তু, ভাই, তুমি কায়দাটা জানো ভালো। টেবিলে তো ভাবখানা দেখালে আমাকে যেন কেয়ারই করো না।' বলে আমার গালে দিল একটি মিষ্টি ঠোনা।'

চাচা বললেন, 'আমি তখন মরমর। ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'আপনি ভুল করেছেন। আমায় মাপ করুন।' মেয়েটা তখন একটু যেন বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার এই প্রাচ্যদেশীয় টানা-ঠ্যালা, টানা-ঠ্যালা কায়দা থামাও। আমার সময় নেই। হয়তো এতক্ষণে আমার বন্ধুর সন্দেহ হয়েছে আর হঠাৎ এখানে এসে পড়বে। তাহলে আর রক্ষে নেই। তোমার ফোন নম্বর কত বলো। আমি পরে কন্টাক্ট করবো। তখন তোমার সবরকম খেলার জন্য আমি তৈরি হয়ে থাকব।'

বাঁচালে! নম্বরটা দিলেই যদি মেয়েটা চলে যায় তাহলে আমিও নিষ্কৃতি পাই। পরের কথা পরে হবে। নম্বর বলতেই মেয়েটা দেশলাইয়ের পোড়াকাঠি দিয়ে চট করে সিগারেটের প্যাকেটে নম্বরটা টুকে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দুশমন এসে ঘরে ঢুকল।

তার চেহারা তখন কপোতের মতো তো নয়ই, বাজপাখির মতোও নয়, মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরচ্ছে, যেন চীনা ড্র্যাগন।

আর সে কী চিৎকার আর গালাগালি! আমি তার বান্ধবীকে বদমায়েশি করে, ধড়িবাজের ফেরেব্বাজি দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি। একই টেবিলে ওয়াইন খেয়ে, বন্ধুত্ব

জমিয়ে এরকম ব্ল্যাকমেলিং, ব্যাকস্ট্যাবিং—আল্লা জানেন, আরো কতরকম কথা সে বলে যাচ্ছিল। সমস্ত বিয়ারখানার লোক তার চতুর্দিকে জড়ো হয়ে গিয়েছে। আমি হতভম্বের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে। মেয়েটা তার আস্তিন ধরে টানাটানি করে বার বার বলছে, 'হানস, হানস, চুপ করো। এখানে সীন করো না। ওঁর কোনো দোষ নেই— আমিই—'

কনুই দিয়ে মেয়েটার পেটে দিল এক গুঁত্তা। চেঁচিয়ে বলল, 'হটে যা মাগী'— অথবা তার চেয়েও অভদ্র কী একটা শব্দ ব্যবহার করেছিল আমার ঠিক মনে নেই। চটলে নাৎসিরা মেয়েদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করে সেটা না দেখলে বোঝবার উপায় নেই। হারেমে বুখারার আমীর তাদের তুলনায় কলসী-কানার বোষ্টম। গুঁতো খেয়ে মেয়েটা কোঁক করে, অদ্ভুত ধরনের শব্দ করে একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল।

'এই বকাবকি আর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ড্র্যাগন আস্তিন গুটোয় আর বলে, "আয়, এর একটা রফারফি হওয়ার দরকার। বেরিয়ে আয় রাস্তায় বাইরে।"

চাচা বললেন, 'আমি তো মহা বিপদে পড়লুম। অসুরের মতো এই দুশমনের হাতে দুটো ঘুষি খেলেই তো আমি উসপার। ক্ষীণকণ্ঠে যতই প্রতিবাদ করে বোঝাবার চেষ্টা করি যে ফ্রলাইনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই, আমার মনে কোনোরকম মতলব নেই, ছিল না, হওয়ার কথাও নয়, সে ততই চেঁচায় আর 'কাপুরুষ' বলে গালাগাল দেয়।'

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা শুধাল, 'আর কেউ মূর্খটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল না যে আপনি নির্দোষ?'

চাচা বললেন, 'তুই এদেশে নতুন এসেছিস তাই এ-সব ব্যাপারের মরাল অথবা ইমরাল কোডের খবর জানিসনে। এদেশে এসব বর্বরতাকে বলা হয়, 'অন্যলোকের ঘরোয়া মামলা', personal matter। এরা আসলে থাকে বিনটিকিটে মজা দেখবে বলে।'

চাচা বললেন, 'ততক্ষণে অসুরটা আবার নাৎসি বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছে— 'যত সব ইহুদি আর বাদ বাকি কালা-আদমি নেটিভরা এসে এদেশের মানইজ্জৎ নষ্ট করে ফেললো! এই করেই বর্ণসঙ্কর (অবশ্য একটা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছিল) হয়, এই করেই দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে, অথচ জর্মনির আজ এমন দুরবস্থা যে এরকম অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারছে না।' বিশ্বাস করবে না, দু-একজন ততক্ষণে তার কথায় সায় দিতে আরম্ভ করেছে আর আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন আমি দুনিয়ার সব চেয়ে মিটমিটে শয়তান, আর কাপুরুষস্য কাপুরুষ।

মাপ চেয়ে নিলে কী হতো বলতে পারিনে, কিন্তু মাপ চাইতে যাব কেন? আমি দোষ করিনি এক ফোঁটা, আর আমি চাইতে যাব মাপ? ভয় পাই আর নাই পাই, আমিও তো

বাঙাল। আমার গায়ের রক্ত গরম হয় না? দুনিয়ার তাবৎ বাঙালদের মানইজ্জৎ বাঁচাবার ভার আমার উপর নয় জানি, কিন্তু এই বাঙালটাই বা এমন কী দোষ করল যে লোকে তাকে কাপুরুষ ভাববে?'

চাচা বললেন, 'আমি বললুম, 'এসো তবে, যখন নিতান্তই মারামারি করবে বলে মনস্থির করেছ, তবে তাই হোক!' মনে মনে বললুম, দুটো ঘুষি সইতে পারলেই চলবে, তারপর তো নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে যাব।

এমন সময় হুঙ্কার শুনতে পেলুম, 'এই যে! সব ব্যাটা মাতাল এসে একত্তর হয়েছে হেথায়। এসো, এসো, আরেক পাত্তর হয়ে যাক, মেলার পরবে—'

চাচা বললেন, 'তাকিয়ে দেখি অস্কার। একদম টং। এক বগলে খালি বোতল, আরেক বগলে ডানা-কাটা পরী। পরীটিও যেন শ্যাম্পেনের বুদ্বুদে ভর করে উড়ে চলেছেন। সেই উৎকট সঙ্কটের মাঝখানেও না ভেবে থাকতে পারলুম না, মানিয়েছে ভালো।

অস্কারকে দুনিয়ার কুল্লে মাতাল চেনে। আমার কথা ভুলে গিয়ে সবাই তাকে উদ্বাহু হয়ে 'আসতে আজ্ঞা হোক, 'বার'-এ দাঁড়াতে আজ্ঞা হোক' বলে অকৃপণ অভ্যর্থনা জানালো।

ওদিকে আমার মোষটা বাধা পড়ায় চটে গিয়ে আরো হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'তবে আয় বেরিয়ে।

তখন অস্কারের নজর পড়ল আমার দিকে। আমাকে যে কী করে সে-অবস্থায় চিনতে পারল তার সন্ধান সুস্থ লোক দিতে পারবে না। পারবেন দিতে অস্কারের মতো সেই গুণী, যিনি মৌজের গৌরীশঙ্করে চড়ে জাগরণসুষুপ্তিস্বপ্নতুরীয় ছেড়ে পঞ্চমে পৌঁছতে পারেন। কাইজারের জন্মদিনের কামানদাগার মতো আওয়াজ ছেড়ে বললে, 'ঐ রেঃ! ঐ ব্যাটা কালা ইন্ডার, মিশ শয়তানও এসে জুটেছে। যেখানেই যাও, শয়তানের মতো সব জায়গায় উপস্থিত। বিয়ার ধরেছিস নাকি? এক পাত্তর হয়ে যাক। আজ তোকে খেতেই হবে। মেলার পরব।'

ষাঁড় আবার হুঙ্কার ছেড়েছে। অস্কার তার দিকে তাকিয়ে, আর তার আস্তিন-টানা মারমুখো তসবির দেখে আমাকে শুধালো, 'ইনি কিনি বটেন?'

আমি হামেহাল জেন্টিলম্যান। শাস্ত্রসম্মত কায়দায় পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু দুশমন অস্কারকে চেঁচিয়ে বললে, 'তুমি বাইরে থাকো ছোকরা। এর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।'

অস্কার প্রথমটায় এরকম মোগলাই মেজাজ দেখে একটুখানি থতমত খেয়ে গেল। খালি বোতলটায় একটা টান দিয়ে অতি ধীরে ধীরে মিনিটে একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলল, 'এর—সঙ্গে—আমার—বোঝাপড়া—আছে? কেন বাবা, এত রাগ কিসের? এই

পরবের বাজারে? তা ইন্ডারটা ঝগড়াটে বটে। হলেই বা। এস, বেবাক ভুলে যাও! খেয়ে নাও এক পাত্তর। মনে রঙ লাগবে, সব ঝগড়া কপ্পুর হয়ে যাবে।'

বলে জুড়ে দিল গান। অনেকটা রবিঠাকুরের 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে' গোছের।

দুশমন ততক্ষণে আমার দিকে ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে এসেছে।

'হাঁ হাঁ করো কী, করো কী?' বলে অস্কার তাকে ঠেকালো। অস্কার আমার সপত্নের চেয়ে দু'মাথা উঁচু। আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? নাৎসিদের ফের গালাগাল দিয়েছিস বুঝি?'

আমি যতটা পারি বোঝালুম। শেষ করলুম, 'কী মুশকিল!' বলে।

অস্কার বলল, 'তা আমি কি তোর মুশকিল আসান নাকি, না তোর ফ্যুরার? আর দেখছিস না ও আমার পার্টির লোক।' আমি হাল ছেড়ে দিলুম।

কিন্তু অস্কারকে বোঝা ভার।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সেই ষাঁড়কে জিজ্ঞেস করল, 'ইন্ডারটা তোমার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরেছিল?'

আমি বললুম, 'ছিঃ অস্কার।'

সপত্ন বলল, 'চোপ!'

অস্কার শুধাল, 'চুমো খেয়েছিল?'

আমি বললুম, 'অস্কার!'

সপত্ন বলল, 'শাট আপ!'

তখন অস্কার সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েটিকে দুহাত দিয়ে চেয়ার থেকে দাঁড় করাল। বললে, 'খাসা মেয়ে।' তারপর বলা নেই কওয়া নেই তাকে জড়িয়ে ধরে বমশেলের মতো শব্দ করে খেল চুমো।

সবাই অবাক। আমিও। কারণ অস্কারকে ওরকম বেহেড মাতাল হতে আমিও কখনো দেখিনি।

কিন্তু আমারই ভুল।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে ফেলে সে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল সেই ছোকরার। একদম সাদা গলায় বলল, 'দেখো বাপু, আমার বন্ধু ইন্ডারটি তোমার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরেনি, চুমোও খায়নি। তবু তুমি অপমানিত বোধ করে তাকে ঠ্যাঙাতে যাচ্ছিলে। ও রোগা টিঙটিঙে কিনা। ওঃ, কী সাহস! কিন্তু আমি তোমার বান্ধবীকে চুমো খেয়েছি। এতে তোমার জরুর অপমান বোধ হওয়া উচিত। আমিও সেই মতলবেই চুমোটা খেলুম। তাই এসো, পয়লা আমাকে ঠ্যাঙাও, তারপর না হয় ইন্ডারটাকে দেখে নেবে।'

হুলুস্থুল পড়ে গেল। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কয়, কিছু বোঝবার উপায় নেই।

ছোকরা পড়ে গেল মহা বিপদে। অস্কারের সঙ্গে বক্সিং লড়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। গেল বছরই এ অঞ্চলের চেম্পিয়ন হয়েছে ঐ সামনের শরাবখানাতেই। ছোকরা পালাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু অস্কার নাছোড়বান্দা। আর পাঁচজনও কথা কয় না—এ রকম রগড় তো পয়সা দিয়েও কেনা যায় না। সব পার্সনাল ম্যাটার কি না!

কিন্তু আমি বাপু ইন্ডার, কালা আদমী। আমি ছুটে গিয়ে ডাকলুম পুলিশ। ফিরে দেখি ছোকরা মুখ বাঁচাবার জন্য মুখ চুন করে কোট খুলছে আর শার্টের আস্তিন গুটোচ্ছে। অস্কার যেন খাসা ভোজের প্রত্যাশায় জিভ দিয়ে চ্যাটাস চ্যাটাস শব্দ করছে।

পুলিশ নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধা দিল। ট্যাক্সি ডেকে কপোত-কপোতীকে বিদেয় করে দিল।

অস্কার বললে, 'ওরে কালা শয়তান, কোথায় গেলি? আমার বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

বান্ধবী সোহাগ ঢেলে শুধালেন, 'আপনি কোন দেশের লোক?' পয়লা কপোতীও ঠিক এই প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করেছিল।

আমি দিলুম চম্পট। অস্কার চেঁচিয়ে শুধালো, 'যাচ্ছিস কোথায়?' আমি বললুম, 'আর না বাবা! এক রাত্তিরে দু-দুবার না।'

কাফে-দে-জেনি

রাত বারোটায় প্যারিসে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ভাবলুম যাই কোথায়? হোটেলে? তাও কি হয়? খাস প্যারিসের বাসিন্দা ছাড়া আর তো কেউ কখনো তিনটের আগে শুতে যায় না। আমার এক রুশ বন্ধুকে প্যারিসে সকাল হওয়ার আগে কখনও বাড়ি ফিরতে দেখিনি। রাত তিনটে-চারটের সময় যদি বলতুম, 'রবের, চল বাড়ি যাই' সে আমার কোটের আস্তিন বেড়ালছানার মত আঁকড়ে ধরে বলত, 'এই অন্ধকারে? তার চেয়ে ঘন্টাতিনেক সবুর করো, উজ্জ্বল দিবালোকে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দিয়ে বাড়ি ফিরব। আমি কি নিশাচর, চৌর, না অভিসারিকা? অত সাহস আমার নেই।'

জানতুম মঁ পার্নাস বা আভেন্যু রশোসূয়ারের কোনো একটা কাফেতে তাকে পাবোই। না পেলেও ক্ষতি নেই, একটু কফি খেয়ে, এদিক-ওদিকে আঁখ মেরে 'নিশার প্যারিসের' হাতখানা চোখের পাতার উপর বুলিয়ে নিয়ে আধা-ঘুমো আধা-জাগা অবস্থায় হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়ব।

জুনের রাত্রি। না-গরম, না-ঠাণ্ডা। প্লাস দ্য লা মাদ্‌লেন দিয়ে থিয়েটারের গানের শেষ রেশের নেশায় এগিয়ে চললুম। গুনগুন করছি:

'তাজা হাওয়া বয়—
খুঁজিয়া দেশের ভুঁই।
ও মোর বিদেশী যাদু
কোথায় রহিলি তুই?'*

ভাবছি রাধার চেয়ে কৃষ্ণের প্রেম ছিল ঢের বেশি ফিকে। অথচ ত্রিস্তানের প্রেম কি ইজলদের চেয়ে কম ছিল? না, জর্মনরা অপেরা লিখতে পারে বটে, ইতালিয়েরা গাইতে পারে বটে, কিন্তু ফরাসীরা রস চাখতে জানে বটে। বলেও, 'খাবার তৈরি করা তো

---

* কবিতাটির একটি ছত্র ইলিয়টের 'ওয়েস্টল্যান্ড' কবিতায় আছে,

'Frisch weht der Wind
Der Heimat zu
Mein Irisch Kind
Wo weilest Du?'

রাঁধুনির কর্ম, খাবেন গুণীরা। আমরা অপেরা লিখতে যাব কোন দুঃখে?'

দেখি, হঠাৎ কখন এক অজানা রাস্তায় এসে পড়েছি। লোকজনের চলাচল কম। মোটরের ভেঁপু প্রায় বাজেই না। চঞ্চল দ্রুত জীবনস্পন্দন থেকে জনহীন রাস্তায় এসে কেমন যেন ক্লান্তি অনুভব করলুম। একটু জিরোলে হত। তার ভাবনা আর যেখানেই থাক প্যারিসে নেই। কলকাতায় যে রকম পদে পদে না হোক বাঁকে বাঁকে পানের দোকান, প্যারিসেও তাই। সর্বত্র কাফে। প্রথম যেটা চোখে পড়ল সেটাতেই ঢুকে পড়লুম।

মাঝারি রকমের ভিড়। নাচের জায়গা নয়। ক্যানেস্তারা ব্যান্ড বা রেডিওর বাদ্যি-বাজনা নেই দেখে সোয়াস্তি অনুভব করলুম। একটা টেবিলে জায়গা খালি ছিল। শুধু একজন খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা—কালো টুপীতে সোনালি হরফে 'ল্য মাতাঁ' লেখা—চোখ বন্ধ করে সিগারেটে দম দিচ্ছেন, সামনে অর্ধশূন্য কফির পেয়ালা। আমি একটু মোলায়েম সুরে বললুম, 'মসিয়ো যদি অনুমতি করেন—।' 'তবে এই টেবিলে কি অল্পক্ষণের জন্য বসতে পারি?' —এই অংশটুকু কেউ আর বলে না। গোড়ার দিকটা শেষ না হতেই সবাই বলে, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!' কিন্তু ল্য মাতাঁর হরকরা দেখলুম সে দলের নন। আমার বাক্যের প্রথমার্ধ শেষ করে যখন 'বিলক্ষণ বিলক্ষণ' শোনবার প্রত্যাশায় থেমেছি, তিনি তখন চোখ মেলে মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে, স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, আমার অনুরোধ শব্দে শব্দে ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করলেন, 'মসিয়ো যদি অনুমতি করেন, তবে?—তবে কী?' এ হেন অপ্রয়োজনীয় অবান্তর প্রশ্ন আমি হিল্লি-দিল্লি-কলোন-বলোন কোথাও শুনিনি। কী আর করি, বললুম, 'তবে এই টেবিলে অল্পক্ষণের জন্য বসি।' ল্য মাতাঁ বললেন, 'তাই বলুন। তা না হলে আপনি যে আমার গলাকাটার অনুমতি চাইছিলেন না কী করে জানব? যারা সকলন বাক্যের পূর্বার্ধ বলে উত্তরার্ধ নির্ণয় করে না, তারা ভাষার কোমর কাটে। মানুষের গলা কাটতে তাদের কতক্ষণ? বসুন।' বলে ল্য মাতাঁ চোখ বন্ধ করে সিগারেটে আরেক-প্রস্ত দীর্ঘ দম নিলেন। অনেকক্ষণ পরে চোখ না মেলেই আস্তে আস্তে বললেন, যেন কোনো ভীষণ প্রাণহরণ উচাটন মন্ত্র জপে যাচ্ছেন, 'ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতা, তাও আবার আমার সামনে!'

আমি বে-বাক অবাক। এ আবার কোন রায়বাঘা সাহিত্যরথী রে বাবা! কিন্তু রা কাড়তে হিম্মৎ হল না, পাছে ভাষা নিয়ে ভদ্রলোক আরেক দফা একতরফা রফারফি করে ফেলেন। আধঘন্টাটাক কেটে যাওয়ার পর ল্য মাতাঁ মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে যেন ঘুম ভাঙালেন। ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফরাসী জানেন বলে মনে হচ্ছে।' কথাটা ঠিক প্রশ্ন নয়, তথ্য নিরূপণও নয়। আমি তাই বিনীতভাবে শুধু 'ওয়াঁও ওয়াঁও'—গোছ একটা শব্দ বের করলুম। অত্যন্ত শান্তস্বরে ল্য মাতাঁ বললেন, 'ভাষা সৃষ্টি কী করে হল তার সমাধান সাধনা নিষ্ফল। এ জ্ঞানটা প্যারিসের ফিলোলজিস্ট

এসোসিয়েশনের ছিল বলেই তাদের পয়লা নম্বর আইন, তাদের কোনও বৈঠকে ভাষার সৃষ্টিতত্ত্ব, গোড়াপত্তন নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না। তবু অনায়াসে এ কথা বলা যেতে পারে যে সৃষ্টির আদিম প্রভাতে মানুষের ভাষা ছিল না, পশুপক্ষীর যেমন আজও নেই। আজও পশুপক্ষীরা কিচির-মিচির করে ভাব প্রকাশ করে। মানুষ কিন্তু 'ওয়াঁও, ওয়াঁও' করে না!'

লোকটার বেআদবী দেখে আমি থ' হয়ে গেলুম। ল্য মার্তাঁ জিজ্ঞেস করলেন, 'ফের্নাঁ র‍্যমোর নাম শুনেছেন?' গোসসা হয়ে বেশ উষ্মার সঙ্গে বললুম, 'শুনিনি।' 'শুনিনি!' ল্য মার্তাঁ অতি বিজ্ঞের অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, 'জানেন না, অথচ কী গর্ব যে জানেন না। এই গর্ব যেদিন লজ্জা হয়ে সর্ব অস্তিত্বকে খর্ব করবে, সেদিন সে লজ্জার জ্বালা জুড়োবেন কোন পঙ্ক দিয়ে? ও রেভোয়া!' বলে ল্য মার্তাঁ গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে লোকটার কথা খানিকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলুম। তারপর আপনমনেই বললুম, 'দুত্তোর ছাই, মরুক গে!' একটা খবরের কাগজের সন্ধানে ওয়েটারকে ডেকে বললুম, 'কোনো একটা বিকেলের কাগজ, সকালেরটা বেরিয়ে থাকলে তাই ভালো।' ওয়েটার খানিকক্ষণ হাবার মতো আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি বিদেশী, মসিয়ো, তাই জানেন না, আমাদের ক্লিয়াঁতেল-গ্রাহকরা সবাই জিনিয়স। কাফের নাম 'কাফে দে জেনি'—প্রতিভা কাফে। এনরা কেউ খবরের কাগজ পড়েন না। তবে সবাই মিলে একটা সাপ্তাহিক বের করেন—গ্রীক ভাষায়। তার একখণ্ড এনে দেব?' আমি বললুম 'থাক।' এসিরিয়ন কি ব্যাবিলনিয়ন যে বলেনি সেই অন্তত এ পুরুষের ভাগ্যি।

ততক্ষণে দেখি আরেকটি ভদ্রলোক ল্য মার্তাঁর শূন্য চেয়ারখানা চেপে বসেছেন। বেশ মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললেন, 'আপনি বুঝি ফের্নাঁ র‍্যমোর বন্ধু?' আমি জিজ্ঞেস করলুম 'ফের্নাঁ র‍্যমো কে?' ভদ্রলোকটি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন? এই যার সঙ্গে কথা বলছিলেন।' —হালে পানি পেলুম। হাল মালুম হল। বললুম, 'না, এই প্রথম আলাপ।' 'ও, তাই বলুন। আমার নাম পল রনাঁ। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশি হলুম।' 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, আমার নাম ইরশাদ চৌধুরী।' শুধালুম, 'মসিয়ো কি গ্রীক খবরের কাগজ পড়েন?' রনাঁ উত্তর দিলেন, 'আপনি আমাদের কাগজটার কথা বলছেন তো? না আমি গ্রীক জানিনে। কিন্তু ওয়েটারটা জানে। আঁরিকে ডাকব? সে আপনাকে তর্জমা করে শুনিয়ে দেবে। তবে তার ফরাসী বোঝাও এক কর্ম।'

গোলকধাঁধাটি আমার কাছে আরো পেঁচিয়ে যেতে লাগল। জিজ্ঞেস করলুম, 'মসিয়ো র‍্যমো কি ল্য মার্তাঁয় কাজ করেন?' রনাঁ বললেন, 'পেটের দায়ে। এক কাপ কফি মেরে সে তিন দিন কাটাতে পারে। কিন্তু চার দিনের দিন? বছরদশেক পূর্বে তার একটা কবিতা

বিক্রি হয়েছিল। পয়সাটা পেলে ভালো করে এক পেট খাবে। হালে যে কবিতাটা 'ল্য মেরক্যুরে' পাঠিয়েছিল, তারা সেটার কোঠা ঠিক না করতে পেরে বিজ্ঞাপন ভেবে মলাটে ছাপিয়েছে। কিন্তু টাকার দুঃখ এইবার তার ঘুচল বলে। বাস্তাইয়ের জেলে ফাঁসুড়ের চাকরিটা খালি পড়েছে। র‍্যমো দরখাস্ত করেছে। খুব সম্ভব পাবে। ফাঁসী দেওয়াতে ওয়াকিবহাল হয়ে যখন নূতন কবিতা ঝাড়বে তখন আর সব চ্যাংড়াদের ঘায়েল করে দেবে।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কিছু লেখেন?'

'লেখাপড়াই ভুলে গিয়েছি, তা লিখব কী করে?'

'লেখাপড়া ভুলে গিয়েছেন মানে?'

'মানে অত্যন্ত সরল। আমি ছবি আঁকি। ছবি আঁকার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতিতে লোপ করে দিতে হয়। কবিতা, গান, নাচ—এককথায় আর সব কিছু তখন শুধু অবান্তর নয়, জঞ্জাল। নদী যদি তরঙ্গের কলরোল তোলে তবে কি তাতে সুন্দরী ধরার প্রতিচ্ছবি ফোটে? ঝাড়া দশটি বছর লেগেছে, মোশয়, ভাষা ভুলতে। এখন ইস্তেক রাস্তার নামও পড়তে পারিনে, নাম সইও করতে পারিনে। বেঁচে গেছি। জীবনের প্রথম প্রভাতে মানুষ কী দেখেছিল চোখ মেলে?—যুগ যুগ সঞ্চিত সভ্যতার বর্বর কলুষ-কালিমামুক্ত জ্যোতির্দৃষ্টি দিয়ে? তাই দেখি, তাই আঁকি।'

লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। বললুম, 'সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ তার অনুভূতির প্রকাশ কি 'ওঁয়াও ওঁয়াও' করে করেনি?' দেখলুম রনাঁ বড় মিষ্টি স্বভাবের লোক। বাধা পেয়ে বাঘা জিনিয়সের মতো তেড়ে এলেন না। পুরুষ্টু গালে টোল লাগিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, 'র‍্যমো বলেছে তো? ও তার স্বপ্ন। আর স্বপ্ন মানেই তো ছবি। স্পর্শ নেই, গন্ধ নেই, শব্দ নেই। এমনকি সে ছবিতে রঙও নেই, কম্পজিশনও নেই। সে বড় নবীন ছবি, সে বড় প্রাচীন ছবি। সে তো আত্মদর্শন, ভূমাদর্শন!'

জিজ্ঞেস করলুম, 'সে ছবি বুঝবে কে? তাতে রস পাবে কে? আমাদের চোখের উপর যে হাজার হাজার বৎসরের সভ্যতার পলস্তরা।'

রনাঁ বড় খুশি হলেন। মাথা হেলিয়ে-দুলিয়ে বললেন, 'লাখ কথার এক কথা বললেন মসিয়ো। তাই বলি প্রাচ্যদেশীয়রা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি অসভ্য, অর্থাৎ সভ্য। চিরকাল মুক্তির সন্ধান করেছে বলে তাদের চোখ মুক্ত। চলুন, আপনাকেই আমার ছবি দেখাব।' জানলার পাশে বসেছিলেন, পর্দাটা সরিয়ে বললেন, 'এই আলোতেই আমার ছবি দেখার প্রশস্ততম সময়।'

বৃথা আপত্তি করলুম না। বাইরে তখন ভোরের আলো ফুটছে।

রাস্তায় চলতে চলতে রনাঁ বললেন, 'আদিম প্রভাতের সৃষ্টি দেখতে হলে প্রদোষের অর্ধনিমীলিত চেতনার প্রয়োজন।'

তেতলার একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। ডাক দিলেন, 'নানেৎ।'

ঘরের চারদিকে তাকাবার পূর্বে নজর পড়ল নানেতের দিকে। শোফায় অর্ধশায়িতা কিশোরী না যুবতী ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। একগাদা সোনালি চুল আর দুটি সুডৌল বাহু। রনাঁ আলাপ করিয়ে দিলেন, 'মসিয়ো ইরশাদ, নানেৎ—আমার মডেল, ফিয়াঁসে, বন্ধু। নানেৎ, জানলাগুলো খুলে দাও।'

চারদিকে তাকিয়ে আমার কী মনে হয়েছিল আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত ছবি আর ছবি। আগাগোড়া যেন ক্যানভাসে মোড়া। সোফাতে, মেঝেতে, কৌচে, চেয়ারে সর্বত্র ছবি ছড়ানো। অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন অর্থবিহীন অতি নবীন না বহু প্রাচীন তালগোল পাকানো বস্তুপিণ্ড, না জ্বরের বেঘোরে ঘোরপাকখাওয়া আধা-চেতনার বিভীষিকার সৃষ্টি? পাঁশুটে, তামাটে, ঘোলাটে, ধোঁয়াটে—এ কী?

হঠাৎ কানে গেল, রনাঁ ও নানেতে যেন আলাপ হচ্ছে।

'নানেৎ'।

'মন আমি (বন্ধু)।'

'দেখছ?'

'তুমি ছাড়া কি কেউ কখনো এমন সৃষ্টির কল্পনা করতে পারত?'

'নানেৎ'।

'প্যারিস, পৃথিবী তোমাকে রাজার আসনে বসাবে।'

'না বন্ধু, আমার আসন চিরকাল তোমার পায়ের কাছে। নানেৎ, মা শেরি (প্রিয়তমে)।'

'মন আমি।'

নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে এলুম। দেখি প্রভাতসূর্য ইফেল মিনারের কোমরে পৌঁচেছে। চোখাচোখি হতে যেন স্বপ্ন কেটে গেল।

'রবেরের মুখে তাই—
হামেশাই,
নিশার প্যারিসে কভু, হাবা ওরে, বলি তোরে, কাফে ছেড়ে বাহিরিতে নাই।'

বিধবা-বিবাহ

আমাদের পুজো-সংখ্যা ইংরেজদের ক্রিসমাস স্পেশালের অনুকরণে জন্মলাভ করেছিল কি না সে-কথা পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন, কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ইংরিজি স্পেশালের চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রিসমাস সংখ্যাগুলোতে থাকে অসংখ্য ছেলেমানুষি গল্প আর এন্তার গাঁজা—বছরের আর এগারো মাস ইংরেজ হাঁড়িপানা মুখ করে থাকে বলে ঐ একটা মাস সে মুখের সব লাগাম ছিঁড়ে ফেলে যা-খুশি-তাই বকে নেয়। আমাদের পুজো-সংখ্যায় এ-সব পাগলামি থাকে না। তাই ভেবে পাইনে সত্যি-মিথ্যেয় মেশানো এদেশের আজগুবি গল্পগুলো ঠাঁই পাবে কোথায়, কোন মোকায়?

এতদিন ইংরেজের নকল করতে বাধো বাধো ঠেকত। ভয় হত পাছে লোকে ভাবে 'খানবাহাদুরির' তালে আছি। এখন পুজোর গাঁজায় দম দিয়ে দু'চারখানা গুল ছাড়তে আর কোনো প্রকারের বাধা না থাকারই কথা। অবশ্য সত্যি-মিথ্যের মেকদার যাচাইয়ের জন্য পাঠক জিম্মাদার।

বরোদার ভূতপূর্ব মহারাজা তৃতীয় সয়াজী রাও-এর কথা এদেশের অনেকেই জানেন। ইনি বিলেত থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, মৌলানা মুহম্মদ আলীকে এবং এদেশ থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত আম্বেডকরকে বেছে নিয়ে বরোদার উন্নতির জন্য নিয়োগ করেন। এককালে 'প্রবাসী'তে এঁর সম্বন্ধে অনেক লেখা বেরিয়েছিল। বরোদা রাজ্যের দু-একজন বৃদ্ধের মুখে আমি শুনেছি, অরবিন্দ বাঙলাদেশে যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তাতে নাকি সয়াজী রাও-এর গোপন সাহায্য ছিল।

ইনি আসলে রাখাল-ছেলে। বরোদার শেষ মহারাজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গদিচ্যুত হলে পর, ইনি তাঁর নিকটতম আত্মীয় বলে এঁকে দূর মহারাষ্ট্রের মাঠ থেকে ধরে এনে গুজরাতের বরোদা রাজ্যের গদিতে বসানো হয়। তখন তাঁর বয়স ষোলর কাছাকাছি। বরোদার তখন এমনি দুরবস্থা যে দিবা-দ্বিপ্রহরে নেকড়ে বাঘ শহরের আশপাশ থেকে মানুষের বাচ্চা ধরে নিয়ে যেত—সরকারী চাকুরেদের বছরতিনেকের মাইনে বাকি থাকতো বলে দেশটা চলতো ঘুষের উপর, আর তাবৎ বরোদা স্টেটের ঋণ

নাকি ছিল ত্রিশ কোটি টাকার মতো।

সয়াজী রাও প্রায় বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। সারদা এ্যাক্ট পাস হবার বহু পূর্বেই তিনি নিজে জোর করে আইন বানিয়ে আপন রাজ্যে বালবিবাহ বন্ধ করেন, খয়রাতি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালান, হিন্দু লগ্নচ্ছেদের (ডিভোর্স) আইন চালু করেন, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি খোলার বন্দোবস্ত করেন ও মরার সময় স্টেটের জন্য ত্রিশ কোটি টাকা রেখে যান। বরোদা শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় কলকাতাকে হার মানায়, সে পাল্লা দেয় বোম্বাই-বাঙ্গালোরের সঙ্গে।

এই মহারাজাই দিল্লীর দরবারে ইংরেজ রাজার দিকে পিছন ফিরে, ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গটগট করে বেরিয়ে এসেছিলেন বলে তাঁর গদি যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অরবিন্দের ব্যাপারে ইংরেজ তাঁর উপর এমনিতেই চটা ছিল, তার উপর এই কাণ্ড— এরকম একটা অজুহাত ইংরেজ খুঁজছিলও বটে। এ-ব্যাপার সম্বন্ধে স্বয়ং সয়াজী রাও লিখেছেন, 'ইংরেজ আমাকে গদিচ্যুত করতে চেয়েছিল বাই গিভিং দি ডগ এ ব্যাড নেম।' তিনি দরবারে হিজ ম্যাজেস্টিকে কতটা অসৌজন্য দেখিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে নানালোকের নানা মত, কিন্তু ফাঁড়াটা কাটাবার জন্য তিনি যে লাখ পনরো ঘুষ দিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে সব মুনিই একমত। ব্রিটিশ প্রেসেরও চাপ নাকি ভালো করে তেল ঢাললে ঢিলে হয়ে যায়।

এসব কথা থেকে সাধারণ লোকের ধারণা করা কিছুমাত্র অন্যায় নয় যে সয়াজী রাও খাণ্ডারবিশেষ ছিলেন। তা তিনি ছিলেনও, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর রসবোধ ছিল অসাধারণ—শুধু রাজারাজড়াদের ভিতরেই নয়, জনসাধারণের পাঁচজন বিদগ্ধ লোককে হিসেবে নিলেও।

সার ভি. টি. কৃষ্ণমাচারীর নাম অনেকেই শুনেছেন। ইনি কিছুদিন পূর্বেও জয়পুরের দেওয়ান (প্রধানমন্ত্রী) ছিলেন ও উপস্থিত কোথায় যেন আরো ডাঙর নোকরি করেন। ইনি যখন বরোদার দেওয়ানরূপে আসেন তখন তিনি উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এবং আর কিছু পারুন আর নাই পারুন, একথা সত্যি, বক্তৃতা দিতে গেলে তাঁর টনসিল আর জিভে প্যাঁচ খেয়ে যেত। এখনো সে উৎপাতটা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

শুনেছি, তিনি যখন বরোদায় এলেন তখন 'সয়াজী বিহার ক্লাব' তাঁকে একখানা যগ্যির দাওয়াত দিলে। স্বয়ং মহারাজ উপস্থিত। শহরের কুতুবমিনাররা সব বোম্বাই-বোম্বাই লেকচর ঝাড়লেন, ভি. টি.'র মতো মানুষ হয় না, এক এ্যাডাম হয়েছিলেন আর তারপর ইনি, মধ্যিখানে স্রেফ সাহারা ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুতুবরা ভি. টি'কে সপ্তম-স্বর্গে চড়িয়ে দিয়ে যখন থামলেন তখন—

কৃষ্ণমাচারী-পানে সয়াজী রাও হাসিয়া করে আঁখিপাত।
চোখের পর চোখ রাখিয়া মূক কহিল ওস্তাদজি,
ভাষণ ঝাড়ো এবে উমদা ভাষণ, ভাষণ এরে বলে ছি!

ভি. টি.'র শত্রুরা বলে তাঁর পা নাকি তখন কাঁপতে শুরু করেছিল। অসম্ভব নয়, তবে একথা ঠিক তিনি অতি কষ্টে, নিতান্ত যে ধন্যবাদ না দিলেই নয়, তাই বলে ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন।

সর্বশেষে মহারাজার পালা। বুড়ো বলতেন খাসা ইংরেজি। অতি সরল এবং অত্যন্ত চোস্ত—সর্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার বিবর্জিত।

সামান্য দু-একটা লৌকিকতা শেষ করে সয়াজী রাও বললেন, 'দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে বরোদা রাজ্য চালনা উপলক্ষে আমি বহু মহাজনের সংস্রবে এসেছি এবং তাঁদের সকলের কাছ থেকেই আমি কিছু-না-কিছু শিখে আমার জীবন সমৃদ্ধশালী করেছি। এই দিওয়ানের কাছ থেকে শিখলুম বাকসংযম।'

শক্তিশেল খেয়ে লক্ষ্মণ কী করেছিলেন রামায়ণে নিশ্চয়ই তার সালঙ্কার বর্ণনা আছে—পাঠক সেটি পড়ে নেবেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সয়াজী রাও-এর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পাভলোভা এদেশে আসার বিশ বৎসর পূর্বে তিনি ভরতনাট্যম উত্তর ভারতে চালু করবার জন্য একটা আস্ত ট্রুপ নিয়ে বিস্তর জায়গায় নাচ দেখিয়েছিলেন। উত্তর ভারত তখনও তৈরি হয়নি বলে দক্ষিণ কন্যাদের সে-নৃত্যের কথা আজ সবাই ভুলে গিয়েছে।

বরোদার 'ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট' দেশ-বিদেশে যে খ্যাতি অর্জন করেছে তার সঙ্গে ভারতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না। এ স্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও বলবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না যে, প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। ইনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র।

সয়াজী রাও-এর অনুরোধেই শিল্পী নন্দলাল বসু বরোদার 'কীর্তি মন্দিরের' চারখানি বিরাট প্রাচীর চিত্র এঁকে দিয়েছেন। নন্দলাল এত বৃহৎ কাজ আর কোথাও করেননি।

নীচের কিংবদন্তিটি পড়ে পাছে কেউ ভাবেন সয়াজী রাও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, তাই তাঁর বহু কীর্তি থেকে এই সামান্য দু-একটি উদাহরণ দিতে বাধ্য হলুম।

গল্পটি আমাকে বলেছিলেন পুব বাঙলার এক মৌলবী সায়েব—খাস বাঙাল ভাষায় বিস্তর আরবী-ফারসী শব্দের বগহার দিয়ে। সে ভাষা অনুকরণ করা আমার অসাধ্য। গ্রামোফোন রেকর্ড পর্যন্ত তার হুবহু নকল দিতে পারে না।

নস্যিতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো ব্রহ্মটান দিয়ে বললেন—'এই বরোদা শহরে কত আজব রকমের বেশুমার চিড়িয়া ওড়াউড়ি করছে, তার মধ্যিখানে সয়াজী রাও কেন যে চিড়িয়াখানা বানিয়েছেন বলা মুশকিল। তিনি নিজে তো সিঙি, অমুক ব্যাটা গাধা, অমুক শালা শুয়োর, তমুক হারামজাদা বিচ্ছু, আর আমি নিজে তো একটা আস্ত মর্কট, না হলে এদেশে আসবো কেন—এসব মজুদ থাকতে চিড়িয়াখানা বানাবার মতলব বোধ করি জানোয়ারগুলোকে ভয় দেখাবার জন্য, যদি বড্ড বেশি তেড়িমেড়ি করে তবে খাঁচা থেকে বের করে বড় বড় নোকরি তাদের দিয়ে দেওয়া হবে।

বাইরের জানোয়ারগুলোর জ্বালায় অস্থির হলে আমি হামেশাই চিড়িয়াখানায় যাই। খুদখেয়ালি অর্থাৎ আত্মচিন্তার জন্য জায়গাটি খুব ভালো। তা সেকথা যাক।

সয়াজী রাও বহু জানোয়ার এনেছেন বহু দেশ ঘুরে। পৃথিবীটা তিনি কবার প্রদক্ষিণ করেছেন, তার হিসেব তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন। একবার বিলেত যাবার সময় তাঁর পরিচয় হল হাবশী দেশের রাজা হাইলে সেলাসিসের সঙ্গে।

আমাদের দেশের লোক সাদা চামড়ার ভক্ত। যে যত কালো সাদা চামড়ার প্রতি তার মোহ তত বেশি, ইয়োরোপে নাকি কালো চামড়ার আদর ঠিক সেই অনুপাতে। একমাত্র হাবশীরাই শুনেছি আপন চামড়ার কদর বোঝে। তাই সায়েবদের দিকে তারা তাকায় অসীম করুণা নিয়ে—আহা, বেচারিদের ও-রকম ধবলকুষ্ঠ হয় কেন?

সয়াজী রাও-এর রঙ কালো। হাবশী রাজা প্রথম দর্শনেই বুঝে ফেললেন, আমাদের মহারাজার খানদান অতিশয় শরীফ। কোনো রকমের বদ-জাত ধলা খুন তাঁর কুলজি-ঠিকুজিতে কভি-ভী দাখিল হতে পারেনি। এ খুনের জন্য আমীর-ওমরাহ, নোকর-খিদমৎগার আপন খুন বহাতে হামেহাল হরবকত হাজির।

হাবশী-রাজ সয়াজী রাও-এর দরাজদিলের নিশানও ঝটপট পেয়ে গেলেন। জাহাজেই রাজার জন্মদিন পড়েছিল—সয়াজী রাও তাঁকে একখানা খাসা কাশ্মীরি শাল ভেট দিলেন। হাবশী-রাজ সে-শাল পেয়ে খুশির তোড়ে বে-এক্তেয়ার। জাহাজময় ঘুরে-ফিরে সবাইকে সে-শাল দেখালেন, লালদরিয়ার গরমিকে একদম পরোয়া না করে সেই লাল শাল গায়ে দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করলেন। চোরচোট্টার ভয়ে শেষতক তিনি শালখানা কাপ্তান সায়েবের হাতে জিম্মা দিলেন।

হাবশী-রাজও কিছু নিকৃষ্টি মনুষ্য নন। সয়াজী রাও-এর দিল-তোড় মহব্বতের বদলে তিনি কী সওগাত দেবেন সে বাবতে বহুৎ আন্দিশা করেও তিনি কোনো ফৈসালা করে উঠতে পারলেন না। তাঁর রাজত্বে আছেই বা কী, দেবেনই বা কী? দুশ্চিন্তায় হাবশী রাজার কালো মুখ আরো কালো হয়ে গেল।'

আমি বললুম, 'অসম্ভব! আমি মিশরে থাকার সময় বিস্তর হাবশী দেখেছি। তারা

খানদানী নয়—তাদের মুখই আরো কালো করা যায় না, খুদ হাবশী-রাজের কথা বাদ দিন।'

মৌলবীসাহেব রাগ করে বললেন, 'ঝকমারি! হাজার দফা ঝকমারি তোমাদের মতো বদরসিককে গল্প বলা। পঞ্চম জর্জের রঙ তো ফর্সা, তবে কি ভয় পেলে তাঁর রঙ আরো ফর্সা হয় না?'

আমি 'আলবৎ আলবৎ' বলে মাপ চাইলুম।

মৌলবীসাহেব বললেন, 'শেষটায় হাবশীরাজ মহারাজের সেক্রেটারির সঙ্গে ভাব জমিয়ে বহুৎ সওয়াল-জবাব করলেন আর মনে মনে একটা ভেট ঠিক করে নিলেন।

সে বৎসর গরম পড়েছিল বেহদ। লু চলেছিল জাহান্নমের হাওয়া নিয়ে, আর আকাশ থেকে ঝরছিল দোজখের আগুন। 'সয়াজী সরোবরের' বেবাক নিলুফরী পানি খুদাতালা বেহেশত বাসিন্দাদের জন্য দুনিয়ার মাথট হিসেবে তুলে নিয়েছিলেন, আর বরোদার জৈনরা পাখিদের জন্য গাছে গাছে জল রেখেছিল হাজারো রুপিয়া খর্চা করে। শুকনো গরমের জুলুমে আমার দাড়ি-গোঁপ পর্যন্ত যখন পট-পট করে ফেটে যাচ্ছিল এমন সময় শহরময় খবর রটলো, হাবশী বাদশাহ হাইলে সেলাসিস মহারাজা সযাজী রাওকে এক জোড়া সিংহ-সিংহী তোফা পাঠিয়েছেন—তাঁর মুল্লুকের সবচেয়ে বড় জানোয়ার। 'হিজ হাইনেস সয়াজী রাও মহারাজ, সেনা-খাস-খেল বাহাদুর, ফরজন্দ-ই-দৌলত-ই-ইনকলিসিয়া, শমশের জঙ্গ বাহাদুরের কদমের ধুলো হবার কিস্মৎ এদের নেই, তবু যদি মহারাজ মেহেরবাণী করে এদের গ্রহণ করেন, তবে হাবশী বাদশাহ বহুৎ, বহুৎ খুশ হবেন।'

সেই গরমের মাঝখানে খবরটা রটল আগুনের মতো। আর গুজোব রটল ধুঁয়োর মতো বা তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। কেউ বলে, 'ওরকম জোড়া-সিংগি লন্ডন শহরের চিড়িয়াখানাতেও নেই,' কেউ বলে, 'হাবশী বাদশা খাস ফরমান দিয়ে মানুষের মাংস খাইয়ে খাইয়ে এদের তাগড়া করিয়েছেন,' কেউ বলে, 'এদের গর্জনের চোটে জাহাজের তাবৎ লস্কর-সারেঙ বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েছে।' আরো কত আজগুবি কথা যে রটলো তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সয়াজী রাও যে খুশ হয়েছিলেন সে সংবাদটাও শহরে রটলো। চিড়িয়াখানার ম্যানেজারের উপর হুকুম হল হাবশী সিংগির জন্য খাস হাবেলি তৈরি করবার। কামাররা সব লেগে গেল খাঁচা বানাতে—দিনভর দমাদ্দম লোহা পেটার শব্দ শুনি, আর শহরের ছোঁড়ারা তখন থেকেই খাঁচার চতুর্দিকে ঝামেলা লাগিয়ে মেহমানদের তসবির-সুরৎ নিয়ে খুশ-গল্প জুড়ে দিয়েছে।

ম্যানেজার বোম্বাই গেলেন সিংগিদের আদাব-তসলিমাত করে বরোদা নিয়ে আসার

জন্য। সেখান থেকে তারে খবর এল মেহমানরা কোন গাড়িতে বরোদা পৌঁছবেন। সেদিন শহরের ছ'আনা লোক স্টেশনে হাজিরা দিল— হুজুরদের পয়লা নজরে দেখবার জন্য। হাবেলিতে যখন তাঁদের ঢোকানো হল, তখন শহরের আর বড় কেউ বাদ নেই। সয়াজী মহারাজ শুনলেও গোসা করবেন না বলে বলছি, খুদ তাঁকে দেখবার জন্যও কখনো এরকমধারা ভিড় হয়নি।

আমিও ছিলুম। আর যা দেখলুম তার সামনে দাঁড়াবার মতো আর কোনো চীজ আমি কখনো দেখিনি। আমার বিশ্বাস এ-জোড়া সিংগি দেখার পর আর কেউ খুদাতালায় অবিশ্বাস করবে না। তোমরা কী সব বলো না, নেচার নেচার—সব কিছু নেচার বানিয়েছে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি তো কখনো বলিনি।'

মৌলবীসাহেব ট্যারচা হাসি হেসে বললেন, 'সিংগি দুটোর সামনে কাউকে আমি বলতেও শুনিনি। তোমাদের ঐ নেচার কোন কোন জিনিস পয়দা করেছেন জানিনে, কিন্তু এরকম সিংগি বানানো তাঁর বাপেরও মুরদের বাইরে।

কী চলন, কী বৈঠন, ক্যা পশম, ক্যা গর্দন! পায়ের নখ থেকে দুমের লোম পর্যন্ত সব কুছ গড়া হয়েছে, স্রেফ এক চীজ দিয়ে—তাকৎ! খুদার কেরামতি বুঝবে কে, তাই তাজ্জব মেনে বার বার তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'এ রকম মাতব্বরকে তুমি এ-দুনিয়ার রাজা না করে মানুষের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিলে কেন?'

'সিংগি জোড়াকে দেখবার জন্য অহমদাবাদ, আনন্দ, ভরোচ, সুরট এমনকি বোম্বাই থেকে লোক আসতে লাগল। ফুল ফুটলে কেউ লক্ষ্য করে, কেউ করে না, চাঁদ উঠলে কেউ খুশি হয়, কেউ তাকায় না। কিন্তু এ-জোড়া সিংগি দেখে মনে মনে এঁদের পায়ে তসলিম দেয়নি, এ রকম লোক আমি কখনো দেখিনি।

তবে আমি নিজে এঁদের দেখেছি সবচেয়ে বেশি। কোঁচড় ভরে ছোলাভাজা নিয়ে সামনের গাছতলায় বসে আমি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছি এই রাজা-রানীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তাঁদের ভাষা বুঝিনি এ কথা সত্য, কিন্তু একটা হক বাৎ আমি তাঁদের ঘোঁতঘোঁতানি থেকে সাফ সাফ বুঝে নিয়েছিলুম, সেটা হচ্ছে এই—হিন্দুস্থান মুলকটা হুজুরদের বিলকুল পছন্দ হয়নি।

তাই যেদিন ফজরের নমাজ পড়ার পর শুনতে পেলুম সিংগিটা মারা গিয়েছে তখন আশ্চর্য হলুম না বটে, কিন্তু পাগলের মতো ছুটে গেলুম চিড়িয়াখানায় আর পাঁচজনেরই মতো। ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি, দেখি এরই মাঝে জলসা জমে গিয়েছে। সবাই মাটিতে বসে গালে হাত দিয়ে খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন এক হাট লোকের সকলেরই বড় ব্যাটা মারা গিয়েছে।

আর সিংহরাজ শুয়ে আছেন পুবদিকে মুখ করে। আহা হা, কী জৌলুস, কী বাহার! দেখে চোখ ফেরাতে পারলুম না। জ্যান্ত অবস্থায় চলাফেরার দরুনই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক তাঁর সম্পূর্ণ শরীরের পরিমাণটা যেন আমার চোখে ঠিক ধরা দেয়নি, আজ স্পষ্ট দেখতে পেলুম কতখানি জায়গা নিয়ে হুজুর শেষ-শয্যা পেতেছেন। মনে মনে বললুম, আলবৎ আলবৎ। এই শেষশয্যা দেখেই কবি ফিরদৌসী তাঁর শাহনামা কাব্যে সোহরাবের মৃত্যুশয্যার বর্ণনা করেছেন।

আর সিংগিনী! সে বোধ হয় তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। সিংহের চতুর্দিকে চক্কর লাগাচ্ছে, তার গা শুঁকছে আর আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কোনো মহারানী ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রীকে সওয়াল করছেন।

বিহানের পয়লা সোনালি রোদ এসে পড়ল সিংহের কেশরে। শাহানশাহ বাদশার সোনার তাজে যেন খুদাতালা আপন হাতে গলা-সোনা ঢেলে দিলেন। সে তসবিরে চোখ ভরে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলুম।

বরোদা শহর শোকে যেন নুয়ে পড়ল। যেখানে যাও, ঐ এক কথা, আমাদের সিংহ গত হয়েছেন।

সেদিন স্কুল-কলেজ বসলো না, ছেলে-ছোকরারা খাঁচার সামনে বসে আছে—চুপ করে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে কারো মুখে কথাটি নেই। আপিস-আদালত পর্যন্ত সেদিন নিমকাম করলো।

সিংগির লাশ বের করতে গিয়ে ম্যানেজারের জিভ বেরিয়ে গেল। সিংগিনী খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। খাবার লোভ দিয়ে যে তাকে পাশের খাঁচায় নিয়ে এ-খাঁচা থেকে লাশ বের করা হবে তারো উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত কী কৌশলে মুশকিল ফৈসালা হল জানিনে, আমি দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম।

তারপর আরম্ভ হল সিংগিনীর গর্জন আর দাবড়ানো। সমস্ত দিন খাঁচার ভিতর মতিচ্ছন্নের মতো চক্কর খায় আর মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে খাঁচার দেয়ালে দেয় ধাক্কা। এরকম খাঁচা ভাঙবার মতলব আগে কখনো সিংহ-সিংহী কারো ভিতরেই দেখা যায়নি। এখন সিংগিনী খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু বেড়ে গেছে খাঁচাটাকে ভাঙবার চেষ্টা। সেই দুর্বল শরীর নিয়ে কখনো সমস্ত তাগদ দিয়ে খাঁচায় দেয় ধাক্কা, কখনো শিকগুলোকে খামচায়, আর কখনো লাফ দিয়ে তেড়ে এসে মারে জোর গোত্তা। সে কী নিদারুণ দৃশ্য!

সয়াজী রাও খবর পেয়ে হুকুম দিলেন, 'বাঢ়িয়া, উমদা হাবশী সিংহ যোগাড় করার জন্য আদিস আব্বাবার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনা করো। কিন্তু সাবধান, হাবশীরাজ যেন খবর না পান তাঁর দেওয়া সিংহ মারা গিয়েছে। আর ততদিনের জন্য কাঠিয়াওয়াড় থেকে

একটা দিশী সিংহ আনাবার ব্যবস্থা করো। সেও যেন উমদাসে উমদা হয়, রুপেয়া কা কুছ পরোয়া নাহী।'

সয়াজী রাও বাদশার দয়ার শরীর, তাঁর লোমে লোমে মেহেরবানি। খুদাতালা তাঁর জিন্দেগী দরাজ করুন, হরেক মুশকিল আসান করুন—বরোদার সিংহই বুঝতে পাবে হাবশী সিংগিনীর দর্দ।

এক মাস বাদে বর এলেন কাঠিয়াওয়াড় থেকে। এ এক মাস আমি চিড়িয়াখানায় যাইনি। পাঁচজনের মুখে শুনলুম, সিংগিনীর দিকে তাকানো যায় না—তার চোখমুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরচ্ছে।'

মৌলবী সায়েব গল্প বন্ধ করে জানলার দিকে কান পেতে বললেন, 'আজান পড়লো। তাড়াতাড়ি শেষ করি।

দুলহাকে যখন খাঁচায় পোরা হবে তখন 'চার আঁখে' মিলবার তসবির দেখার জন্য আমি আগেভাগেই খাঁচার সামনে গিয়ে হাজির হলুম। সিংগিনীর চেহারা দেখে আমার চোখে জল এল। অসম্ভব রোগা দুবলা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তেজ কমেনি এক রত্তিও।

কাঠিয়াওয়াড়ের দামাদ এলেন হাতি-টানা গাড়িতে করে। তিনিও কিছু কম না। কিন্তু হাবশী সিংগির যে তসবির আমার মনের ভিতর আঁকা ছিল তার তুলনায় বে-তাগদ, বে-জৌলুস বে-রৌশন। সিংহ হিসেবে খাবসুরৎ, কিন্তু দুলহা হিসাবে না-পাস।

খাঁচার দরজা দিয়ে দামাদ ঢুকলেন আস্তে আস্তে। সিংগিনী এক কোণে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এমন এক অদ্ভুত চেহারা নিয়ে যে আমি তার কোনো মানেই করতে পারলুম না।

তারপর যা ঘটলো তার জন্যে আমরা কেউ তৈরি ছিলুম না। হঠাৎ সিংগিনী এক হনুমানী লম্ফ দিয়ে, খাঁচা ইস-পার উস-পার হয়ে পড়লো এসে সিংগির ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিন কিম্বা চার-খানা বিরাশী শিক্কার থাবড়া! কঠিয়াওয়াড়ি দামাদ ফৌত! বিলকুল ঠাণ্ডা!'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী কথা?'

মৌলবী সায়েব বললেন, 'এক লহমায় কাণ্ডটা ঘটলো। কেউ দেখলো, কেউ না।'

আমি বললুম, 'একটা লড়াই পর্যন্ত দিলে না?'

মৌলবী সায়েব বললেন, 'না।'

আমি বললুম, 'তারপর?'

মৌলবী সায়েব বললেন, 'তারপর আর কিছু না। আমি এখন চললুম, গল্পে মেতে গেলে আমার আর কোনো হুঁশ থাকে না!'

দরজার কাছে গিয়ে মৌলবী সায়েব থামলেন। বললেন, 'হুঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।

খবরটা সয়াজী রাও-এর কাছে পৌছে দিতে কেউই সাহস পান না। শেষটায় তাঁর খাস পেয়ারা শহর-কাজী আর ধর্মাধিকারী নাডকর্ণিকে ধরা হল। তাঁরা যখন খবরটা দিলেন তখন মহারাজ নাকি একদম কোনো রকমেরই চোটপাট করলেন না। উল্টে নাকি মুচকি হাসি হেসে বললেন, 'আমি যখন বিধবা-বিবাহের জন্য একটা নয়া আন্দোলন আরম্ভ করতে চেয়েছিলুম, তখন তোমরাই না গর্ব করে বলেছিলে, এদেশের খানদানী বিধবা—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—নতুন বিয়ে করতে চায় না? হাবশী সিংগিনী এদেরও হার মানাল যে!'

রাক্ষসী

আরাম-আয়েশ ফুর্তি-ফার্তির কথা বলতে গেলেই ইংরেজকে ফরাসী শব্দ ফরাসী ব্যঞ্জনা ব্যবহার করতে হয়। 'জোয়া দ্য ভিভ্‌র্' (শুদ্ধমাত্র বেঁচে থাকার আনন্দ), 'বঁ ভিভ্‌র্' (আরামে আয়েশে জীবন কাটানো), 'গুরমে' (পোষাকি খুশখানেওলা), 'কনেস্যর' (সমঝদার, রসিকজন) এসব কথার ইংরিজি নেই। ভারতবর্ষে হয়তো এককালে ছিল, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ছিল—মৃৎশকটিকা, মালতীমাধব নাট্যে আরাম-আয়েশের যে চৌকশ বর্ণনা পাওয়া যায় তার কুল্লে মাল তো আর গুল-মারা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—আজ নেই এবং তার কারণ বের করার জন্যও ঘেরণ্ড সংহিতা ঘাঁটতে হয় না। রোগশোক অভাব অনটনের মধ্যিখানে 'গুরমে' হওয়ার সুযোগ শতেকে গোটেক পায় কিনা সন্দেহ—তাই খুশ-খানা, খুশ-পিনা বাবদের কথাগুলো বেবাক ভারতীয় ভাষা থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে, নতুন বোল-তানের প্রশ্নই ওঠে না।

তবু এই 'বঁ ভিভ্‌রের' কায়দাটা এখনো কিছু জানে পশ্চিম ভারতের পার্সী সম্প্রদায়। খায়দায়, হৈ-হুল্লোড় করে, মাত্রা মেনে ফষ্টিনষ্টি ইয়ার্কি-দোস্তি চালায় এবং তার জন্য দরকার হলে 'ঋণং কৃত্বা' নীতি মানতেও তাদের আপত্তি নেই। 'তাজ' হোটেলে বসে মাসের মাইনে এক রাত্তিরে ফুঁকে-দেনেওলা বিস্তর পার্সী বোম্বাইয়েই আছে। আর গোলাপী নেশায় একটুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে কোনো পার্সী ছোকরা যদি ল্যাম্পপোস্টটাকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি' বলে ঝপাঝপ গণ্ডাদশেক চুমো খেয়ে ফেলে তাহলে তার বউ হয় স্ন্যাপশট তোলে, নয় 'চ, চ, বাইরাম তোর নেশা চড়েছে' বলে ধাক্কাধাক্কি দিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। পরদিন ক্লাবে বসে বউ 'পাগলা বাইরামের' কীর্তি-কাহিনীতে বেশ একটুখানি নুন-লঙ্কা লাগিয়ে মজলিস গরম করে তোলে, আর বাইরামের বাপ গল্প শুনে মিটমিটিয়ে হাসে, ব্যাটার 'এলেম' হচ্ছে দেখে আপন ঠাকুর্দার স্মরণে খুশি হয়ে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

গাওনা বাজনায় ভারি শখ। একদল বেটোফেন-ভাগনার নিয়ে মেতে আছে, আরেকদল বরোদার ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের সাকরেদী করে। আর 'লাল্লা লাল্লা লা' গান গেয়ে নাকি বহু পার্সী বাচ্চা মায়ের গর্ভ থেকে নেমে এসেছে।

অন্য কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে এ-সব কথা বলতে আমি সাহস পেতুম না, কিন্তু

পার্সীদের ঈষৎ রসবোধ আছে, তা সে সূক্ষ্মই হোক, আর স্থূলই হোক। আলাপ জমাতেও ভারি ওস্তাদ। বিদেশীকে খাতির করে ঘরে নিয়ে যায়, বাড়ির আর পাঁচজনকে নতুন চিড়িয়া দেখাবে বলে। তাকে কাঠি বানিয়ে সবাই মিলে তার চতুর্দিকে চর্কিবাজির নাচন তুলবে বলে।

তাই বরোদা পৌঁছবার তিনদিনের ভিতরই রুস্তম দাদাভাই ওয়াডিয়া গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপচারী করলেন, বাড়ি নিয়ে গিয়ে বুড়ো বাপ, বউ, তিন ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরের দিনই পার্সী সম্প্রদায়ের ধানসাক (আমাদের লুচিমণ্ডা) খাবার নেমন্তন্ন পেলুম। এবং সেদিনই খানা শেষে বললেন, 'আসছে রোববার সন্ধ্যেয় বোমানজী নারিমানের দু'ছেলের নওজোত। আপনার নেমন্তন্ন রয়েছে। আসবেন তো?'

আমি তো অবাক। এ দুনিয়ায় পার্সী বলতে আমি মাত্র এই ওয়াডিয়া পরিবারকেই চিনি। বোমানজী নারিমান লোকটি কে, এবং আমাকে নেমন্তন্ন করতে যাবেই বা কেন? আমি বললুম, 'নারিমানকে তো চিনিনে!'

ওয়াডিয়া বললেন, 'চিনে আপনার চারখানা হাত গজাবে নাকি (পার্সীরা ইয়ার্কি না করে কথা কইতে পারে না)? খাওয়ায় ভালো—সেইটে হল আসল কথা। এই নিন আপনার কার্ড—ও দিয়েও আপনার চারখানা হাত গজাবে না। আপনি ভাববেন না আমি নারিমানের দোরে ধন্না দিয়ে এ কার্ড বের করেছি। আপনার সঙ্গে আমাদের জমে গিয়েছে নারিমান সেটা নিজের থেকেই জানতে পেরে কার্ডটা পাঠিয়ে দিয়েছে। না পাঠালে অবিশ্যি আমি একটুখানি নল চালাতুম—আপনার মতো গুণীকে বাদ দিয়ে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি গুণী!'

ওয়াডিয়া বললেন, 'বাঁধা ছালার দাম পঁচিশ লাখ। দু দিন বাদে সব শালা (পার্সীরা এই শব্দটি প্রায় সবকথার পিছনেই লাগায়) আপনাকে চিনে নেবে, কিছু ভয় নেই। তদ্দিন দু পেট খেয়ে নিন। নারিমানের ছেলেদের নওজোতের পরে আসছে সোরাবজীর মেয়ের বিয়ে, তারপর আসছে—'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'নওজোত পরবটা কী?'

বললেন, 'এলেই দেখতে পাবেন। হিন্দুদের যেমন পৈতে হয়, পার্সীদের তেমনি 'নওজোত'। শুধু 'কস্তি' অর্থাৎ পৈতেটা বাঁধতে হয় কোমরে, আর সঙ্গে পরতে হয় একটি ছোট্ট ফতুয়া—তার নাম 'সদরা'। এই 'কস্তি'-'সদরা' দুয়ে মিলে হল পার্সীদের দ্বিজত্বপ্রাপ্তি।'

ওয়াডিয়ার বউ রৌশন বললেন, 'যত্ত সব সিলি স্যুপারস্টিশনস!'

রুস্তম বললেন, 'লঙ লিভ সচ স্যুপারস্টিশনস। এদেরই দৌলতে দু মুঠো খেয়ে নিই।

শালা বোমানজীর পেটে বোমা মারলেও সে এক পেট খাওয়ায় না। তার বাপ শালা (সবাই শালা!) বিয়ে করেছিল বিলেতে, শ্যাম্পেনটা-কেকটা ফাঁকি দেবার জন্য।'

পার্সীদের পাল্লায় পড়লে বুঝতেন। রোববার বিকেলবেলা রুস্তম বউ, বেটাবাচ্চা নিয়ে গাড়ি করে আমার বাড়িতে উপস্থিত—পাছে আমি ফাঁকি দিই।

গাড়িতে বসে বললেন, 'পার্সীদের কী নাম দিয়েছে আর সব গুজরাতিরা জানেন? 'কাগড়া' অর্থাৎ ক্রো। তার প্রথম কারণ, আমরা কালো কোট টুপি পরি, দ্বিতীয় কারণ পাঁচটা পার্সী একত্র হলেই কাকের মতো কিচিরমিচির করি, তৃতীয় কারণ কাকের মতো খাদ্যাখাদ্য বিচার করিনে—জানেন তো আর সব গুজরাতিরা শাকখেকো—চতুর্থ কারণ আমাদের নাকটা কাকের মতো বাঁকানো, আর শেষ কারণ মরে গেলে কাকে আমাদের মাংস খায়।' তারপর হো-হো করে খুব খানিকটা হেসে বললেন, 'গুজরাতিদের রসবোধ নেই সবাই জানে, কিন্তু এ রসিকতাটা মোক্ষম।'

আমি বললুম, 'সব হিন্দুই একবার স্মোক করে, সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাক আর নাই থাক, সেটা জানেন?'

বললেন, 'কী রকম?'

'তাদের তো পোড়ানো হয়, দেন দে স্মোক।'

রৌশন বললেন, 'তবু ভালো, শকুনির ছেঁড়াছেঁড়ির চেয়ে স্মোক করা ঢের ভালো।'

আমি বললুম, 'কেন? চারটে শকুনি যদি এক পেট খেতে পায় তাতে আপত্তিটা আর কী? এই আপনাদের বোমানজী যদি জ্যান্ত অবস্থায় কাউকে খাওয়াতে না চায় তবে না হয় মরে গিয়েই খাওয়ালো।'

রৌশন বললেন, 'আপনি জানেন না তাই বলছেন। বোম্বায়ে টাওয়ার অফ সায়লেন্সের আশপাশের কোনো বাড়িতে কখনো বাসা বাঁধলে জানতেন। একটা শকুনি হয়তো একটা মরা বাচ্চার মাথাটা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আপনার বাড়ির উপর দিয়ে, আরেক শকুনির সঙ্গে লাগলো তখন তার লড়াই। ছিটকে পড়ল মুণ্ডুটা আপনার পায়ের কাছে, কিংবা মাথার উপরে। ভেবে দেখুন তো অবস্থাটা। তিন বছরের বাচ্চার মুণ্ডু, গলাটা ছিঁড়েছে শকুনে—'

আমি বললুম, 'থাক, থাক।' কিন্তু আশ্চর্য, ওয়াডিয়াঁর বাচ্চা দুটো শিউরে উঠলো না কিংবা মাকে এ সব বীভৎস বর্ণনা দিতে বারণ করল না। অনুমান করলুম, এরা ছেলেবেলা থেকেই এ-বিষয়ে অভ্যস্ত।

নওজোত অনুষ্ঠান হচ্ছিল একটা প্ল্যাটফর্মের উপর। সাদা জাজিমে মোড়া। দুটি আট-ন বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে, আর চারজন 'দস্তুর' (পুরোহিত) আবেস্তা, পহ্লবী ভাষায় গড়গড়

করে মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। এককালে যজ্ঞোপবীত দেবার সময় পুরোহিত ছেলেটাকে মন্ত্রোচ্চারণ দিয়ে বোঝাতেন যজ্ঞোপবীতের দায়িত্ব কী, আজ যে সে উপবীত ধারণ করতে যাচ্ছে তার অর্থ—মায়ের কোল আর খেলাধুলো তার জন্য শেষ হল, সে আজ সমাজে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এখন ক'টা ছেলে এ সব বোঝে তা জানিনে, কিন্তু এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, 'নওজোত'-ও উপনয়নের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে—যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে।

ফিসফিস করে কথা বলতে মানা নেই। আমি রুস্তমকে আমার গবেষণামূলক তত্ত্ব-চিন্তাটি অতিশয় গাম্ভীর্য সহকারে নিবেদন করাতে তিনি বললেন, 'আপনার তাতে কী, আমারই বা তাতে কী? রান্নাটা ভালো হলেই হলো।'

বুঝলুম, 'ইতর জনের জন্য মিষ্টান্ন'—প্রবাদটি সর্বদেশে প্রযোজ্য।

নওজোত শেষ হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে নামল ঝমাঝঝম বৃষ্টি। অকালে এ রকম বৃষ্টির জন্য কেউ তৈরি ছিলেন না। নিমন্ত্রিত-রবাহূত সবাই ছুটে গিয়ে উঠলেন বাড়ির বারান্দায়। তারপর বৃষ্টির ঝাপটা খেয়ে, একদল ড্রইং-রুমে, আরেক দল ডাইনিং-রুমে, আত্মীয়-কুটুমরা বেডরুমে ঢুকলেন। আমাকে রুস্তম নিয়ে গেলেন ছোট্ট একটা কুঠুরিতে, বোধ হয় বাচ্চা দুটোর পড়ার ঘর।

আমরা জনা বারো সেই কুঠুরিতে কাঁঠাল-বোঝাই হয়ে বসলুম। সকলের শেষে এসে ঢুকলেন এক বুড়ো পার্সী দু'বগলে দু'বোতল মদ নিয়ে। আমরা কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান নিরামিষ ছিলুম, আমাদের জন্য এল আইসক্রীম, লেমনেড।

বুড়ো একটা বোতল ছেড়ে দিলেন মজলিসের জন্য। অন্য বোতলটা নিজে টানতে লাগলেন নির্জলা। বিলেতে পালা-পরবে, ঘরে-বাইরে সর্বত্রই মদ খাওয়া হয়, তাই আমি এন্তার মদ খাওয়া দেখেছি। কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলুম, এ বুড়ো তালেবর ব্যক্তি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে পেশাদারী ব্রাহ্মণের পাইকারি বহ্বান্ন ভক্ষণের মতো এঁর পাইকারি পান দ্রষ্টব্য বস্তু।

মদ খেলে কেউ হয়ে যায় ঝগড়াটে, কেউ বা আরম্ভ করে বদ রসিকতা, কেউ করে খিস্তি, কেউ হয়ে যায় যীশুখ্রীষ্ট—দুনিয়ার তাবৎ দুঃখকষ্ট সে তখন আপন স্কন্ধে তুলে নিতে চায়, আর সবাইকে গায়ে পড়ে টাকা ধার দেয়। পরের দিন অবশ্য চাকরের উপর চালায় চোট-পাট, ভাবে (পার্সী হলে) ঐ শালাই মোকা পেয়ে টাকাটা লোপাট মেরেছে।

আমি গিয়েছিলুম এক কোণে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসব বলে। বোতলটি আধঘন্টার ভিতর শেষ করে বুড়ো এসে বসলেন আমারই পাশে। আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে স্থান করে দিলুম। বুড়ো শুধোলেন, 'আপনি এ-শহরে নতুন এসেছেন?' আমি কীর্তিটা অস্বীকার করলুম না। বললেন, 'তাই ভাবছেন আমি মাতাল?'

বুঝলুম ইনি যীশুখ্রীষ্ট টাইপ নন, ইনি হচ্ছেন মেরি ম্যাগডলীন টাইপ। —অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত। বললুম, 'কই আপনি তো দিব্য আর পাঁচজনের মতো কথা কইছেন!'

বললেন, 'এক বোতলে আমার কিছু হয় না, পাঁচ বোতলেও কিছু হয় না, দশ বোতলেও না—যদিও অতটা কখনো খেয়ে দেখিনি।'

সত্যি লোকটার গলা সাদা, চোখের রঙ থেকেও বিশেষ কিছু অনুমান করা যায় না— বুড়োবয়সের ঘোলাচোখে রঙের ফেরফার সহজে ধরা পড়ে না। পাকা বাঁশে তেল লাগালেও একই রঙ।

বললুম, 'তাহলে না খেলেই পারেন।'

বললেন, 'খাই না তো, হঠাৎ ও রকম অকালে বৃষ্টি না নামলে।'

মদ খাওয়ার নানা অজুহাত বাজারে চালু আছে। এটা নতুন। বৃষ্টির জলের সঙ্গে নামল বটে, কিন্তু ধোপে টিকবে না। বললুম 'হুঁ'।

'আপনিও খেতেন।'

'? ? ? ?'

'সে অবস্থায় পড়লে।'

আমি শুধালুম, 'কোন অবস্থায়?' তারপর বললুম, 'কিন্তু আপনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন কেন? বিশেষত আপনার ধর্মে যখন ও জিনিস বারণ নয়।'

'আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি কারণ আর সবাই জানে—'

আমি বললুম, 'তাহলে বলুন।'

বললেন, 'রুস্তম বলছিল, আপনি নাকি পুব-ভারতের লোক, পার্সীদের আচারব্যবহার পালা-পরব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। টাওয়ার অফ সায়লেন্স কাকে বলে জানেন?'

আবার 'মৌন শিখর'! বললুম, 'আজই প্রথম শুনেছি।'

বললেন, 'কুয়োর মতো গোল করে গড়া হয়। আর দেয়ালের ভিতরের দিকে বড় বড় শেলফের মতো কুলুঙ্গি বা 'নিশ' কাটা থাকে। সেগুলোর উপর মড়াকে বিবস্ত্র করে শুইয়ে দেওয়া হয়। বোম্বাই-টোম্বাই অঞ্চলে বিস্তর শকুনি ওত পেতে বসে থাকে, তিন মিনিটের ভিতর হাড্ডিগুলো ছাড়া সব কিছু সাফ করে দেয়। কিন্তু ভিতরে গিয়ে এ-সব দেখবার হুকুম নেই। একমাত্র 'শববাহক'ই ভিতরে যায়। এই যে নওজোতের সময় 'দস্তুর'দের দেখলেন তেমনি পার্সীদের ভিতরে বিশেষ 'শববাহক' সম্প্রদায় আছে। টাওয়ার অফ সায়লেন্সের ভিতর যা কিছু করার তারাই সব করে। এমন কি 'দস্তুর'দেরও ভিতরে যাওয়া বারণ।

আমার জন্ম মধুগাঁয়ে, সেখানেই প্রায় সমস্ত জীবন কাটিয়েছি। মধুগাঁও সি. পি.-তে। আপনি কখনো যাননি? তাহ'লে বুঝতেন গ্রীষ্মকালে সেখানে কী রকম গরম পড়ে। আর

সে গরম একদম শুকনো—বোন-ড্রাই। দেয়ালের কেলেন্ডার বেঁকে যায়, বইয়ের মলাট বাঁকতে বাঁকতে কেতাব থেকে খসে পড়ে, টেবিলটা পর্যন্ত পিঠ বাঁকিয়ে বেড়ালটার মতো লড়াইমুখো হয়ে ওঠে। এমনকি মানুষদেরও রস-কষ শুকিয়ে যায়। হাতাহাতির ভয়ে গরমের দিনে একে-অন্যে কথাবার্তা পর্যন্ত হয় নিক্তি-মেপে।

সেই গরমে মারা গেল এক আশী বছরের হাড্ডিসার বুড়ি। আমার ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন যুবতী—বকা ছোঁড়ারা তখনই তাঁর নাম দিয়েছিল 'ঝরাপাতা', 'কুকুরের জিভ'। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকোতে শুকোতে শেষ পর্যন্ত রইল চামড়ায় জড়ানো খানকয়েক হাড্ডি। আর স্বভাব ছিল এমনি খিটখিটে যে আমরা পারতপক্ষে তার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যেতুম না। বিশ্বাস করবেন না, বেটি বারান্দায় বসত এক গাদা নুড়ি নিয়ে। কেউ ভুলেও তার বাড়ির সামনে দাঁড়ালে নুড়ি ছুঁড়তে আরম্ভ করত তাগ করে—আর সে কী মোক্ষম তাগ! 'প্র্যাকটিস মেকস পার্ফেক্ট' রচনায় এক ছোঁড়া বুড়ির উদাহরণ দিয়ে আমার কাছ থেকে ফুলমার্ক পেয়েছিল।

বুড়ির ত্রি-সংসারে কেউ ছিল না, প্রকাণ্ড একটা কুকুর ছাড়া। কিন্তু কুকুরটার উপর তো আর বুড়ির শেষ ক্রিয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভারটা পড়লো আমাদের ঘাড়েই। মহাবিপদে পড়ল মধুগাঁয়ের পার্সী সম্প্রদায়।

এককালে মধুগাঁয়ে বিস্তর পার্সী বসবাস করতো বলে তারা শহরের মাইলখানেক দূরে ভাল টাওয়ার অফ সায়লেন্স বানিয়েছিল। আপন 'শববাহক'ও জনআষ্টেক ছিল। কিন্তু সে হল সত্তর-আশি বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে পার্সী সংখ্যা ক্রমে-ক্রমে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র দশ-বারোটি পরিবারে। তাই মৃত্যুর হার এসে দাঁড়িয়েছে বছরে এক কিংবা তার চেয়েও কম। টাওয়ার অফ সায়লেন্সের শকুনগুলো পর্যন্ত পালিয়েছে না খেয়ে মর-মর হয়ে। মানুষের বুদ্ধি শকুনের চেয়ে বেশি, তাই শববাহকের দল শকুনগুলোর বহুপূর্বেই মধুগাঁও ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

তাই সমস্যা হল বুড়িকে বয়ে নিয়ে যাবে কে? এসব ব্যাপারে পার্সীরা বামুনদের চেয়ে তিনকাঠি বেশি গোঁড়া। 'শববাহক' না হলে তো চলবে না—বরঞ্চ পার্সী সম্প্রদায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে তিন দিন কাটিয়ে দেবে তবু 'শববাহক' ভিন্ন কেউ মরা ছুঁতে পারবে না।

টেলিগ্রাম করা হল এক আঁটা—চতুর্দিকের পার্সীদের কাছে, পার্সী-ধর্ম লোপ পায়, পার্সী-ঐতিহ্য গেল গেল, তোমরা সব আছো কী করতে, চারটে শববাহক না পেলে মধুগাঁও উচ্ছন্নে যাবে, সৃষ্টি লোপ পাবে।

শববাহকেরা শেষটায় এল। এক ছোকরা 'দস্তুর' তখনো মিসিং লিঙ্কের ন্যাজের মতো

খসি-খসি করে মধুগাঁয়ের পশ্চাদ্দেশে ঝুলছিল, সে মন্তর-ফন্তরগুলো সেরে দিলে— হোলি জিসসই জানেন তার কতটা শুদ্ধ কতটা ভুল।

সেই মার্চ মাসের আগুনের ভিতর দিয়ে চারটে শববাহক, 'দস্তুর'জী আর আমারই মতো আরো দুই মূর্খ গেলুম টাওয়ার অফ সায়লেন্সে। গেটের কাছে শববাহক ছাড়া আর সবাইকে দাঁড়াতে হল। একটা গাছ পর্যন্ত নেই যার ছাওয়ায় একটু কম গরম হই। সান্ত্বনা এইটুকু যে শববাহকেরা রেকর্ড টাইমের ভিতর বেরিয়ে এল। গেটে তালা মেরে আমরা সবাই ধুঁকতে ধুঁকতে শহরে ফিরে এলুম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম আর যদি কখনো ঐ হতভাগা টাওয়ারে যেতে হয় তবে যাব, শেষবারের মতো, শববাহকদের কাঁধে চেপে।

কিন্তু খুদার কেরামতির কে ভেদ করবে বলো? তিন মাস যেতে না যেতে মরলেন আমার বিধবা পিসি—বাবা বিদেশে, মা বহুকাল পূর্বেই গত হয়েছেন। বাড়িতে সোমত্থ আর কেউ নেই। আমি পাগলের মতো শববাহকের সন্ধানে দুনিয়ার চেনা-অচেনা সবাইকে তার করলুম। মে মাসের অসহ্য গরম পড়েছে আকাশ ভেঙে—মধুগাঁয়ে যে ক' ফোঁটা বিষ্টি হয় সে জুলাই মাসে, তার পূর্বে ও-মুল্লুকে কখনো মেঘ করেনি, বৃষ্টি ঝরেনি। ধরণী যে ঠাণ্ডা হবেন তার কোনো আশা-ভরসা নেই জুলাই মাস পর্যন্ত। 'দস্তুর'টিও ইতিমধ্যে ন্যাজটার মতো খসে পড়েছেন, তারই বা সন্ধান পাই কোথায়?

ভাগ্যিস, আমি ইস্কুল মাস্টার। আমার ছেলেরা ছুটলো এদিক-ওদিককার শহরে। তারা সব হিন্দু, দু-একটি মুসলমান, কিন্তু গুরুর দায় বুঝতে পেরে কেউ সাইকেলে চড়ে, কেউ লোকাল ধরে এমনি লাগা লাগলো যে মনে হল তারা বুঝি কুয়েশচেন পেপার লীক হওয়ার সন্ধান পেয়েছে। ভগবান তাদের মঙ্গল করুন, সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ছেলেদের বললুম, 'বাবারা আমায় বাঁচালে। কিন্তু আর না। তোমাদের আর সঙ্গে আসতে হবে না। আর শোনো, এই গরমে যদি টাওয়ার যেতে-আসতে আমি মরি তাহলে আমাকে পুড়িয়ে ফেলো, না হয় গোর দিয়ো।'

আমি বললুম, 'সে কী কথা!'

আমার কথা যেন আদপেই শুনতে পাননি সেইরকম ভাবে বলে যেতে লাগলেন, 'যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কড়াইয়ে গরম তেল ফুটছে আর আমি তারই ভিতর সাঁতার কেটে কেটে টাওয়ারের দিকে চলেছি। এক পা ফেলি আর ভাবি এ-দুনিয়ায় এই শেষ পা ফেলা, পরের কদমেই দেখব জাহান্নমের বুকিং আপিসের সামনে 'কিউয়ে' পৌঁছে গিয়েছি— স্বর্গে যাওয়ার হলে ভগবান এই কড়াই-ভাজার প্র্যাকটিস কপালে লিখবেন কেন?

টাওয়ার অফ সায়লেন্সের সামনে এসে বসে পড়েছি। 'দস্তুর'জীর শেষ মন্ত্রোচ্চারণ

আমার কানে এসে পৌঁচচ্ছে যেন কোন দূরদুরান্ত থেকে। বোঝা-না-বোঝার মাঝখান দিয়ে যেন কিছু দেখছি, কিছু শুনছি। শববাহকেরা ক্লান্ত শ্লথ গতিতে মড়া নিয়ে টাওয়ারের ভিতর ঢুকল।

তার পরমুহূর্তেই আমার সমস্ত চৈতন্য ফিরে এল, টাওয়ারের ভিতর থেকে এক সঙ্গে অনেকগুলো তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে। সে চিৎকারে ছিল মাত্র একটা জিনিস—ভয়! যারা চিৎকার করলো তারাই যে শুধু ভয় পেয়েছে তা নয়, সে চীৎকার যেন স্পষ্ট ভাষায় বললো, আর কারো নিস্তার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে চারজন শববাহকের দুজন পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে এদিক-ওদিক টাল খেয়ে খেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। একজন আমাদের দিকে তাকিয়েই একমুখ ফেনা বমি করে পড়ল 'দস্তুর'জীর পায়ের কাছে, আরেকজন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সেইরকম টাল খেয়ে খেয়ে যে কোন দিকে চলল সে জানে না। 'দস্তুর'জীও একবার তার দিকে তাকান আরেকবার তাকান ভিরমি-যাওয়া লোকটার দিকে। টাওয়ারের ভিতর থেকে আর কোনো শব্দ আসছে না, কিন্তু যে পাগলটা ছুটে চলেছে সে চিৎকার করে করে যেন গলা ফাটিয়ে দিচ্ছে—সে কী অমানুষিক বীভৎস কণ্ঠস্বরের বিকৃত পরিবর্তন।

'দস্তুর'জী আর আমি এমনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি যে আমাদের মাথায় কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই খেলছে না, পা দুটো যেন মাটিতে শেকড় গেড়ে বসে গিয়েছে। হতভম্ব হয়ে গিয়েছি বললে অল্পই বলা হল, কারণ অদ্ভুত এক ভীতি আমাকে তখন অসাড় করে ফেলেছে।

কতক্ষণ এ রকম ধারা কাটলো আমার মনে নেই। আস্তে আস্তে মাথা সাফ হতে লাগল, কিন্তু ভয় তখনো কাটেনি। 'দস্তুর'জী বললেন, 'আর দুটো শববাহকের কী হল? তারা বেরচ্ছে না কেন?' আমার মনেও সেই প্রশ্ন, উত্তর দেব কী?

'দস্তুর'জী—আমার দুজনেরই ভিতরে যাওয়া বারণ। 'দস্তুর'জীর কর্তব্যবোধ হয়েছে না কি, কে জানে, বললেন, 'চলুন, ভিতরে যাই।'

আমার এখনো মনে হয়, 'দস্তুর'জী তখন সম্পূর্ণ সম্বিতে ছিলেন না। আমি জানি আমি নিশ্চয়ই ছিলুম না। তাঁর পিছনে পিছনে কোন সাহসে ভর করে গেলুম বলতে পারব না। আমি এ-বিষয়ে বহু বৎসর ধরে আপন মনে তোলপাড় করেছি। খুব সম্ভব যুগ যুগ ধরে 'দস্তুর'জীদের হুকুম তামিল করে করে আমরা সাধারণ গৃহী বিপদকালে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এখনো তাঁদের অনুসরণ করি।

ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকে মোড় নিয়েই দেখি—'

ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে গেলেন। আমি বললুম, 'কী, কী?'

আমার দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে বললেন, 'এই যেরকম আমি আপনার দিকে

তাকালুম, ঠিক সেইরকম তাকিয়ে আছে টাওয়ারের দেয়ালের একটা শেলফের ভিতর পা ছড়িয়ে বসে, ঘাড় আমাদের দিকে ফিরিয়ে সেই হাড্ডিসার বুড়ি যাকে আমরা তিন মাস আগে এই টাওয়ারে রেখে গিয়েছিলুম। গায়ের চামড়া আরো শুকিয়ে গিয়েছে, আর—আর, চোখের কোটর দুটো ফাঁকা, কালো দুই গর্ত। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।'

হুঙ্কার দিয়ে ভদ্রলোক বললেন,'কেউ আমাকে একটা বোতল দেবে না, নাকি রে?'

অথবা ঐ রকম কিছু একটা। আমি স্পষ্ট শুনতে পাইনি। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। কী করে যে এ রকম ব্যাপার সম্ভবপর হতে পারে সে কথা জিজ্ঞেস করবার মতো হিম্মৎ বুকে বেঁধে উঠতে পারছিনে, পাছে আরো ভয়ঙ্কর কোনো এক বিভীষিকা তিনি আমার চোখের সামনে তুলে ধরেন।

হঠাৎ যেন আমার প্রতি ভদ্রলোকের দয়া হল। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না। আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলছি।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলুম তখন দেখি আমার উপর কে যেন বালতি বালতি জল ঢালছে। তারপর বুঝলুম বৃষ্টি নেমেছে। আমার চতুর্দিকে স্কুলের ছেলেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেই যে শববাহক পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল তাকে ও রকম অবস্থায় একা দেখতে পেয়ে ছেলেরা আমাদের সন্ধানে এখানে এসে পৌঁচেছে।

যে দুজন শববাহক ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তারা আর কখনো জ্ঞান ফিরে পায়নি। যে বাইরে এসে ভিরমি গিয়েছিল, সে পরে সুস্থ হল বটে, কিন্তু তার মাথা এখনো সম্পূর্ণ ঠিক হয়নি—আর যে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তাকে এখনো পাগলা গারদে বেঁধে রাখা হয়েছে। একমাত্র 'দস্তুর'জীই এই বিভীষিকা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

অথচ ব্যাপারটা পরে পরিষ্কার বোঝা গেল। বুড়ি ছিল হাড্ডিসার, গায়ে একরত্তি চর্বি ছিল না, যেটুকু মাংস ছিল তা না থাকারই শামিল। তিন মাসের গরমে বুড়ী শুঁটকি হয়ে এমনি এক অদ্ভুত ধরনে বেঁকে গিয়েছিল যেন পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে উঠে বসেছে—শুধু চোখ দুটো একদম উপে গিয়েছে। সর্বশরীরের কোথাও এতটুকু আঁচড় নেই—আপনাকে আগেই বলেছি মধুগাঁও থেকে সব শকুন বহুদিন পূর্বেই পালিয়ে গিয়েছিল।

এক সাধুর কৃপায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলুম। কিন্তু অকালে বৃষ্টি নামলে আমাকে এখনো বোতল বোতল মদ খেয়ে ছবিটা মগজ থেকে মুছে ফেলতে হয়।'

পাদটীকা

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরেজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা ছেলেভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ-বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা যাঁরা কোনোগতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই-স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশি কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম। শুনেছি কোনো কোনো ইস্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাশীর চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই, কিন্তু এ কথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনো পরান্ন ভক্ষণ করেননি—পালাপরব শ্রাদ্ধনিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাঙলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল, অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা—ঘৃণা বললেও হয়তো বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজি হতেন—অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন বাঙলা রচনায় 'দোলা-লাগা', 'পাখি-জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভাল খেলা—সেদিন কাজে লেগে গিয়েছিল। এবং তার পরমুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু ক উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।'

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশি, এবং টেবিলের

উপর পা দুখানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশি। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন, এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিতমশাই বারংবার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিতমশাইকে খুশি করবার পন্থা বাড়ন্ত হলে ঐ বিষয়টি নতুন করে উত্থাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিতমশাই একটু বেশি স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই। ঐ 'দোলা-লাগা, পাখি-জাগা'ই আমার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে একমাত্র গোমাংস ভক্ষণ। পণ্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানা প্রকার কটুকাটব্য বর্ষণ করে। 'অনার্য', 'শাখা-মৃগ', 'দ্রাবিড়-সম্ভূত' কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সাধারণত সম্বোধন করতেন না। তা ছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে পণ্ডিতমশাই শ্লীল-অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না করে। এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধরূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনো মনস্থির করতে পারিনি যে সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি, কোনটা বেশি হয়েছে।

পণ্ডিতমহাশয়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি-গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত—অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর। ক্লাসে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন, আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্রবারের মতো স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দুখানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তারপর যে কোনো একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যেদিন কোনো অজুহাতই পেতেন না—ধর্মসাক্ষী সে-কসুর আমাদের নয়—সেদিন দু' চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায়—আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, 'কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মতো নিষ্ফল নয় কি?' তারপর কখনো আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড়বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে টানা-পাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনো প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস, পণ্ডিতমশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এরকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান—একথা অস্বীকার করার জো নেই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজো যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়। সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু পা-তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে-পড়া, টিকিতে দোলা-লাগা, কাষ্ঠাসন শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ, আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিতমশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন?

সে-সময়ে আসামের চীফ-কমিশনার ছিলেন এন. ডি. বীটসন বেল। সায়েবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে তাঁর নাম, আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘন্টা'। 'এন. ডি.'তে হয় 'নন্দদুলাল' আর বীটসন বেল অর্থ 'বাজায় ঘন্টা'— দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘন্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে।

ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সে-ই একদিন খবর দিল লাটসাহেব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে—পদ্মর ভগ্নিপতি লাটের ট্যুর ক্লার্ক না কী, সে তাঁর কাছ থেকে পাকাখবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল আগমন অবিমিশ্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। একদিক দিয়ে যেমন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ কসুর বিন-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাস্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা-চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাস্টারমশায়ের মেজাজ যখন সক্কলের প্রাণ ভাজা-ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করছে এমন সময় খবর পাওয়া গেল, শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার স্কুলের সর্বত্র চর্কিবাজির মতন তুর্কিনাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সে দিকেই হেডমাস্টার—নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলো যমজ ভাই আছেন, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব কজনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বলল, 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'দেখেই আয় না ছাই!'

পদ্ম আর যা করে করুক কখনো বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাস্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানলা দিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড! আমাদের পণ্ডিতমশাই একটা লম্বা-হাতা আনকোরা নতুন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদ বাকি মাস্টাররা কলরব করে সে-গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন। নানা মুনি নানা গুণ কীর্তন করছেন। কেউ বলছেন পণ্ডিতমশাই কী বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছেন (গাঁজা, পণ্ডিতমশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তিও ছিল না), কেউ বলছেন আহা, যা মানিয়েছে (হাতি, পণ্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মতো দেখাচ্ছিল), কেউ বলছেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জির আবার ফিট-অফিট কী?)! শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলবীসায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভশচায, এ রকম উমদা গেঞ্জি স্রেফ দুখানা তৈরি হয়েছিল। তার-ই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানি দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর কারো কপালে এ রকম গেঞ্জি নেই।'

চাপরাশী নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেন্ড পিরিয়ডে বাঙলা। পণ্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিতমশাই পাঞ্জাবি-শার্ট পরেন না। কিন্তু লাটসায়েব আসছেন, শুধু গায়ে ইস্কুলে আসা চলবে না তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই-করা কাপড়ের পাপ থেকে পণ্ডিতমশাই এই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ, সব কিছুর জন্যই আমরা তখন তৈরি, কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিনমাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ভয়-ডর কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিতমশাই, গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে।'

আধমিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিতমশাই দু'হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত দিয়ে চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনো মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মতো এখানে-ওখানে খ্যাঁসখ্যাঁস করে খামচান।

একে তো জীবন-ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নতুন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু পা তুলে তড়পায়, শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনো করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব, এ কী গব্ব-যন্তণা,' কখনো এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন— লাটসায়েবের সামনে তো সর্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাটসায়েব এলে আমি জানলা দিয়ে দেখতে পাব। তখন না হয় ফের পরে নেবেন।'

বললেন, 'ওরে জড়ভরত, গব্ব-যন্তণাটা খুলছিনে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।' আমি হাত জোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিতমশাইয়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই, শুধু আমাদের কারো কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহ-ভরা চোখে বললেন, 'তুই তো একটা আস্ত মর্কট—শেষটায় আমাকে ডোবাবি না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে, কসম খেলুম।

পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশি ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্ত-দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গ খামচালেন। বুক-পিঠ ততক্ষণে লাল লাল আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোনো বিপদ ঘটল না। পণ্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম, ধাম, কোন দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা, তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময়মতো ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিতমশাই আবার তাঁর 'গব্ব-যন্তণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন। সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটর, ইনসপেকটর, হেডমাস্টার, নিত্যানন্দ—আর লাট সায়েবের এডিসি ফেডিসি না কী সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পানডিট' বলে সায়েব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সেলাম করলেন—এই অনাদৃত পণ্ডিত শ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেয়েও যে কী রকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।

হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃত-তদ্ধিতের বাই জানতেন। তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন-দশেক একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ।' লাটসায়েব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম, প্লীজ।' লাটসায়েব আমাদের বলল 'প্লীজ', এ কী কাণ্ড! তখন আবার আর কেউ রা কাড়ে না। হেডমাস্টার শুধালেন 'বিহঙ্গ', আমরা চুপ—তখনো 'প্লীজের' ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁঠা যতেটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয় দেশে নাম করে ফেলল—আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাটসায়েব ততক্ষণ হেডমাস্টারের সঙ্গে 'পণ্ডিত' শব্দের মূল নিয়ে ইংরেজিতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাস্টার কী বলেছিলেন জানিনে, তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জড়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, যার সব কিছু পণ্ড হয়ে গিয়েছে সেই পণ্ডিত।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব পণ্ডের ইতিহাস হয়তো রবীন্দ্রনাথ জানতেন না—না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়তো একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাটসায়েব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে ফেটে যাবার উপক্রম। আনন্দের আতিশয্যে নতুন গেঞ্জির চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু-তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙলা ক্লাস বসেছে। পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, না শুধু চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনো গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারো দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিতমশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাঁহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ—যোগারূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর—ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি। উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে।'

পণ্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাটসায়েবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাশী নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

বললেন, 'হল না। আর কে ছিল?' বললুম, 'ঐ যে বললুম, এক গাদা এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেননি।'

পণ্ডিতমশাই ভরা মেঘের গুরুগুরু ডাক আরো গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্নবার বলছিস কেন রে মূঢ়? আমি কালা, না তোর মতো অলম্বুষ?'

আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিতমশাই। জিজ্ঞেস করুন না পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে।'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন! চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ—রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন? লাটসায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে—'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি। ওতো এক সেকেন্ডের তরে ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কী বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো।'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম, 'আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।'

'হুঁ' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন।

অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরিতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকোর মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে অনেক সেলাম-টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বর উল্লার শালা, লাটসায়েবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকো নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।'

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকোয় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফট দিতেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাটসায়েবের সব খবর জানে, তোর মতো কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাটসায়েবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কী করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে-খবরটা ও বেশ গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপনমনে আস্তে আস্তে

বললেন, 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী—একুনে আমরা আটজনা।'

তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মদনমোহন কী রকম আঁক শেখায় রে?'

মদনমোহনবাবু আমাদের অঙ্কের মাস্টার—পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালই পড়ান।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'বেশ বেশ। তবে শোন। মিস্বর উল্লার শালা বলল, লাট-সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচা হয়। এইবার দেখি, তুই কী রকম আঁক শিখেছিস। বলতো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয়, তবে ফি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয়?'

আমি ভয় করেছিলুম পণ্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধ করে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'সাধু, সাধু।'

তারপর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবনধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাটসায়েবের কুকুরের কটা ঠ্যাঙের সমান?'

আমি হতবাক।

'বল না।'

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে!'

মূর্খের মতো একবার পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি, সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায়নি—পণ্ডিতমশাই আত্ম-অবমাননার কী নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস শেষের ঘন্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়'—'Silence is golden', যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই।

পুনশ্চ

অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল প্যারিসে। কিন্তু এ রকম ধারা ব্যাপার বার্লিন, ভিয়েনা, লন্ডন, প্রাগ যে-কোনো জায়গায় ঘটতে পারত।

প্যারিসে আমার পরিচিত যে কয়টি লোক ছিলেন তাঁরা সবাই গ্রীষ্মের অন্তিম নিশ্বাসের দিনগুলো গ্রামাঞ্চল অথবা সমুদ্রতীরে কাটাতে চলে গিয়েছেন। বড্ড একা পড়েছি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর গিমে ম্যুজিয়মে সমস্ত সময় কাটান যায় না—প্যারিসের ফূর্তিফার্তি রঙ্গরস করা হয়ে গিয়েছে, তার পুনরাবৃত্তিতে আর কোনো নূতন তত্ত্ব নেই। এসব কথা ভাবছি আর প্লাস দ্য লা মাদলেনের জনতরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে সমুখপানে এগিয়ে চলেছি। এমন সময় শুনি, 'বাঁ সোয়ার মসিয়ো ল্য দক্‌তর।' তাকিয়ে দেখি ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ সুন্দরী যুবতীদের একজন। চেনা চেনা মনে হল কিন্তু চেষ্টা করেও নামটা স্মরণ করতে পারলুম না। অনেকখানি অভিমান মাখিয়ে সুন্দরী অনুযোগ করলেন, 'চিনতেই পারলেন না, অথচ প্যারিসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বেও আপনি আমাকে চিনতেন।' ঠাস করে মাস্টারমশায় চড় মারলে ছেলেবেলায় যে-রকম মন্টেনিগ্রোর রাজধানীর নাম আচম্বিতে মনে পড়ে যেত, ঠিক সেই রকম এক ঝলকে মনে পড়ে গেল, দেশ থেকে মার্সেই হয়ে প্যারিস আসার সময় ট্রেনে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হ্যাট পূর্বেই তুলেছিলুম, এবারে বাও করে বললুম, 'হাজার অনুশোচনা, মনস্তাপ এবং ক্ষমাভিক্ষা, মাদমোয়াজেল শাতিন্নো।' কায়দাকানুন বাবদে প্যারিস-লক্ষ্ণৌ-এ বিস্তর মিল আছে। বিপাকে যদি প্যারিসের এটিকেট সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হন তবে নির্ভয়ে লক্ষ্ণৌ চালাবেন। পস্তাতে হবে না। ইতর ব্যাপারে 'যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট' হতে পারে, কিন্তু ভদ্রতার ব্যাপারে 'আধিক্যে দোষ নেই।'

মাদমোয়াজেল ক্ষমাশীলা। 'আঁশাঁতে (enchanted)', বলে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি দস্তানা পরা হাত ঠোঁটের কাছে ধরলুম— শাস্ত্রে বলে চুমো খাবে, কিন্তু অল্প পরিচয়ে 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' সূত্রই প্রযোজ্য। মাদমোয়াজেল বললেন, 'মা-হারা শিশুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে?' আমি বললুম, 'ললাটস্য লিখন', তিনি বললেন. 'চলুন, আমার সঙ্গে সিনেমায়।'

খেয়েছে। একে তো সিনেমা জিনিসটার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা, তার উপর ঈষৎ অনটনে দিন কাটাচ্ছি। একেবারে যে দরিয়ায় পড়েছি তা নয়, কিন্তু এট্টুখানি ইয়ে— অর্থাৎ কিনা দু দণ্ড জলে গা ভাসাতে হলে যে গামছার প্রয়োজন, মা-গঙ্গাই জানেন তার অভাব কিছুদিন ধরে যাচ্ছে। আনিটা-সিকিটা করব আর ফুর্তিও হবে এমন হিসিবি ব্যসনে আমি বিশ্বাস করিনে। তাই আমার গড়িমসি ভাব দেখে মাদমোয়াজেল বললেন, 'আমার কাছে দু খানা টিকিট আছে—'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ' বইখানার প্রশংসা শুনেছি।' আর এড়াবার পথ রইল না।

মাদমোয়াজেল বললেন, 'এখনো তো ঘন্টাখানেক বাকি। চলুন একটা কাফেতে।'

'চলুন।'

ক্রের বিবি যে পানীয়ের ফরমাইস দিলেন তার নাম আমি কখনো শুনিনি, ওয়েটারটা পর্যন্ত প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। আনতেও অনেক দেরি হল। সে পানীয় এলেনও অদ্ভুত কায়দায়। প্রকাণ্ড গম্বুজের মতো গেলাসের তলাতে আধ ইঞ্চিটাক ফিকে হলদে, খোদায় মালুম কী চীজ। আমি কফির অর্ডার দিলুম।

ক্রের দশ মিনিটেই সেই খোদায়-মালুম-কী শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন, বড্ড গরম, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' তখন ওয়েটার এসে আমাকেই বলল 'চল্লিশ ফ্রাঁ' অর্থাৎ চার টাকার কাছাকাছি। বলে কী! ওই তিন ফোঁটা—যাকগে। ক্রের তখন ব্যাগ থেকে রুমাল বের করছিলেন। ব্যাগ বন্ধ করতে করতে বললেন, 'আপনিই দেবেন, সে কী!' আমি বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়, আনন্দের কথা, হেঁ, হেঁ।'

বেরিয়ে এসে ক্রের প্যারিসের পোড়া পেট্রলভরা বাতাসে লম্বা দম নিয়ে বললেন, 'বাঁচলুম। কিন্তু এখনো তো অনেক সময় বাকি। কোথায় যাই বলুন তো?'

দেশে থাকতে আমি ম্যালেরিয়ায় ভুগতুম। সব সময় সব কথা শুনতে পাইনে।

ক্রের বললেন, 'ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে। সিনেমার কাছেই খোলা হাওয়ায় একটা রেস্তোরাঁ আছে। আপনার ডিনার হয়ে যায়নি তো?'

বাঙালির বদ অভ্যাস আমারও আছে। ডিনার দেরিতে খাই। তবু ফাঁড়া কাটাবার জন্য বললুম, 'আমি ডিনার বড় একটা—'

বাধা দিয়ে ক্রের বললেন, 'আমিও ঠিক তাই। মাত্র এক কোর্স খাই। সুপ না, পুডিং না। রাত্রে বেশি খাওয়া ভারি খারাপ। অগস্টের প্যারিস ভয়ঙ্কর জায়গা।'

ততক্ষণে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। প্যারিসের ট্যাক্সিওলারা ফুটপাথে মেয়েদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে গাহক কি না ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।

জীবনে এই প্রথম বুঝতে পারলুম রবীন্দ্রনাথ কত বেদনা পেয়ে লিখেছিলেন:

'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।'

নিশ্চয়ই ট্যাক্সি চড়ে গিয়েছিলেন, মিটার খারাপ ছিল এবং ভাড়াও আপন ট্যাক থেকে দিতে হয়েছিল। না হলে গানটার কোনো মানেই হয় না। পায়ে হেঁটে গেলে দু মাইল চলতে যা খর্চা, দু লক্ষ মাইল চলতেও তাই।

বাহারে রেস্তোরাঁ। কুঞ্জে কুঞ্জে টেবিল। টেবিলে টেবিলে ঘন সবুজ প্রদীপ। বাদ্যিবাজনা, শ্যাম্পেন, সুন্দরী, হীরের আংটি আর উজির-নাজির-কোটাল। আমার পরনে গ্রে ব্যাগ আর ব্লু ব্লেজার। মহা অস্বস্তি অনুভব করলুম।

ক্রের ওয়েটারকে বললেন, 'কিছু না, শুদ্ধু 'অর দ্য ভর্'।'

'অর দ্য ভর্' এল। বিরাট বারকোষে ডজনখানেক ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য খোপেখোপে সাজানো। সামোন মাছ, রাশান স্যালাদ, টুকরো টুকরো ফ্রাঙ্কফুর্টার, টোস্ট-সওয়ার-কাভিয়ার, ইয়োগুর্ৎ (দই), চিংড়ি, স্টাফ্‌ট অলিভ, সিরকার পেঁয়াজ—এককথায় আমাদের দেশের সাড়ে বত্রিশ ভাজা। তবে দাম হয়তো সাড়ে বত্রিশশ গুণেরও বেশি হতে পারে।

একেই বলে 'এক কোর্স খাওয়া!' কোথায় যেন পড়েছি মোতিলালজী সাদাসিদে কুটির বানাতে গিয়ে লাখ টাকার বেশি খর্চা করেছিলেন। তালিমটা নিশ্চয়ই প্যারিসের 'এক কোর্স খাওয়া' থেকে পেয়েছিলেন।

ওয়েটার শুধাল, 'পানীয়?'

ক্রের ঘাড় বাঁদিক কাত করে বললেন, 'নো', তারপর ডান দিকে কাত করে বললেন, 'উয়ি', ফের বাঁদিকে 'নো', ফের ডান দিকে 'উয়ি'—

আমার 'দোলাতে দোলে মন'—ফাঁসি না কালাপানি?

কালাপানি নয়, শেষ দোলা ডান দিকে নড়ল, অর্থাৎ লাল পানি।

ক্রের দু ফোঁটা ইংরাজিও জানেন। যে পানীয় অর্ডার দিলেন তার গুণকীর্তন করতে গিয়ে আমাকে বুঝিয়ে বললেন,— 'ইৎ ইজ নৎ এ দ্রীন্‌ক বাৎ এ দ্রীম (স্বপ্ন) মসিয়ো, এ জিনিস ফ্রান্সের গৌরব, রসিকজনের মোক্ষ, পাপীতাপীর জর্দন-জল।'

নিশ্চয়ই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এক বাউলকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'যে জন ডুবলো সখী, তার কি আছে বাকি গো?'

তারপর সেই এক কোর্স খাওয়া শেষ হতে না হতেই ওয়েটার এসে আমাদের বলল হঠাৎ এক চালান তাজা শুক্তি এসে পৌঁচেছে। সমস্ত রেস্তোরাঁয় আমরাই যে সবচেয়ে দামি দামি ফিন্‌সি খাদ্য খাবার জন্য এসেছি, এ তত্ত্বটা সে কী করে বুঝতে পেরেছিল; জানিনে। মৃদঙ্গের তাল পেলে নাচিয়ে বুড়িকে ঠেকানো যায় না, এ সত্যও আমি জানি, কাজেই ক্রের যখন ফরাসী শুক্তির উচ্ছ্বাস গেয়ে তার এক ডজন অর্ডার দিলেন, তখন আমি এইটুকু আশা আঁকড়ে ধরলুম যে, যদি কোনো শুক্তির ভেতর থেকে মুক্তো বেরে তবে তাই দিয়ে বিল শোধ করব।

ক্লের ঢেকুর তোলেননি। না জানি কত যুগ ধরে তপস্যা করার ফলে ফরাসী জাতি এক ডজন শুক্তি বিনা ঢেকুরে খেতে শিখেছে। ফরাসী সভ্যতাকে বারংবার নমস্কার।

প্রায় শেষ কপর্দক দিয়ে বিল শোধ করলুম।

সে রাত্রে সিনেমায়ও গিয়েছিলুম। পাঁচ সিকের সিটে বসে 'অল কোয়াএটের' বন্দুক-কামানের শব্দের মাঝখানেও ক্লেরের ঘুমের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। 'নাক ডাকা'টা বললুম না, গ্রাম্য শোনায় আর ফরাসী সভ্যতার দায় যতক্ষণ সে জাগ্রত আছে।

রাত এগারোটায় সিনেমা শেষে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালুম, তখন ক্লের বললেন, 'কোথায় যাই বলুন তো, আমার সর্বাঙ্গ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'নৎর্ দামের গির্জেয়। সেই একমাত্র জায়গা যেখানে পয়সা খর্চা না করেও বসা যায়,' কিন্তু চেপে গেলুম। বললুম, 'আমাকে এই বেলা মাফ করতে হচ্ছে মাদমোয়াজেল শাতিন্নো। কাল আমার মেলা কাজ, তাড়াতাড়ি না শুলে সকালে উঠতে পারব না।'

ক্লের কী বললেন আমি শুনতে পাইনি। ভদ্রতার শেষরক্ষা করতে পারলুম না বলে একটু দুঃখ হল। ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে দশমীর বিসর্জনের মতো দেবীপূজার শেষ অঙ্গ। এত খর্চার পর সব কিছু 'এটুকু বাধায় গেল ঠেকি?' চাবুক কেনার পয়সা ছিল না বলে দামী ঘোড়াটাকে শুধু দানাপানিই খাওয়ালুম, জিনটা পর্যন্ত লাগানো গেল না!

বাস-ভাড়া দিয়ে দেখি আমার কাছে আছে তিনটে কফি, একখানা স্যানডুইচ, আর পাঁচটি সিগরেটের দাম।

আমার কপাল—বাসের টায়ার ফাটলো। আধ মাইল পথ হাঁটতে হবে।

প্যারিসের হোটেলগুলো বেশির ভাগ সংযমী মহল্লায় অবস্থিত। সংযমীর বর্ণনায় গীতা বলেছেন 'সর্বভূতের পক্ষে যাহা নিশা সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন।' তারপর সংযমী সেই নিশাতে কী করেন তার বর্ণনা গীতাতে নেই। আমার ডাইনে-বাঁয়ে যে জনতরঙ্গ বয়ে চলেছে, তাদের চেহারা দেখে তো মনে হল না তাঁরা পরমার্থের সন্ধানে চলেছেন। তবে হয়তো এঁরা অমৃতের সন্তান—অমৃতের সন্ধানে বেরিয়েছেন আর অমৃতের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক ঋষি বলেছেন, 'অমৃতাস্তি সুরালয়েষু' অথবা 'বনিতাধরপল্লবেষু।'

ভারতবর্ষের হিন্দু মূর্খ, সে কাশী যায়, মুসলমান মূর্খ, সে মক্কা যায়। ইয়োরোপীয় সংযমী মাত্রই অমৃতের সন্ধানে প্যারিস যায়।

প্যারিসে নিশাভাগে নারীবর্জিতাবস্থায় চলনে পদে পদে বনিতাধরপল্লব থেকে আপনার কর্ণকুহরে অমৃত প্রবেশ করবে, 'বঁ সোয়ার মসিয়ো—আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক।' আপনি

যদি সে ডাকে সাড়া দেন, তবে—তবে কী হয় না হয় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার নেই, প্রয়োজনও নেই, এমিল জোলার মল্লিনাথও আমি হতে চাইনে। শরৎ চাটুয্যে যা লিখেছেন, তা আমার এখনও হজম হয়নি।

হোটেল আর বেশি দূরে নয়—মহল্লাটা ঈষৎ নির্জন হয়ে আসছে। হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিলুম, তাই আপন অজানতে একটা 'বঁ সোয়ারের' উত্তর দিয়েই বুঝতে পারলুম ভুল করে ফেলেছি। এক সন্ধ্যায় দুই সুন্দরী সামলানো আমার কর্ম নয়। আমার পূর্বপুরুষগণ একসঙ্গে চার সুন্দরী সামলাতে পারতেন। হায়, আমার অধঃপাত কতই গগনচুম্বী থেকে কতই অতলস্পর্শী!

নাঃ, এঁর বেশভূষা দেখে মনে তো হচ্ছে না ইনি 'বসন্তসেনার' সহোদরা, যদিও 'দরিদ্র চারুদত্ত' আমি নিশ্চয়ই বটি। এ রকম নিখুঁত সুন্দরী রাস্তায় বেরুবে কেন? তবে হাঁ, তুলসীদাস বলেছেন, 'সংসার কী অদ্ভুত রীতিতে চলে দেখ, শুঁড়ি দোকানে বসে বসে মদ বিক্রয় করে, সেখানে ভিড়েরও অন্ত নেই, আর বেচারি দুধওলাকে ঘরে ঘরে ফেরি দিয়ে দিয়ে দুধ বিক্রয় করতে হয়।' কিন্তু এ নীতি তো হেথায় খাটে না।

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আপনাকে ঠিক প্লেস করতে পারছিনে।'

সুন্দরী স্মিত হাস্য করলেন, বীণার পয়লা পিড়িঙের মতো একটা ধ্বনিও বেরুল। সে-হাসি এতই লাজুক আর মিঠা যে তকখুনি চিনতে পারলুম যে এঁকে আমি চিনিনে। এরকম হাসি অতি বড় অরসিকও একবার দেখলে ভুলতে পারে না।

কী করি, এ যে আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। এ-সুহাসিনী রসের হাটের বসন্তসেনা নিশ্চয়ই নয়, তবে এরকম গায়ে পড়ে আলাপ করল কেন? আর ভালো-মন্দ কোনো কিছু বলছেই বা না কেন? এ কী রহস্য! নাঃ, কালই প্যারিস ছাড়ব। ক্রসওয়ার্ড আমি কাগজেই পছন্দ করি, জীবনে নয়।

হঠাৎ হোঁচট খেয়ে বেচারি পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি তাকে তুলে ধরলুম। শুধালুম, 'কী হয়েছে?' বলল, 'রাস্তার দোষ নয়, আমি বড্ড ক্লান্ত।'

আমি জানি আমার পাঠকরা আমাকে আর ক্ষমা করবেন না, বলবেন, 'ওরে হস্তীমূর্খ, এক সন্ধ্যায় দু-দুবার ইত্যাদি।' তবু স্বীকার করছি আমি আবার সেই আহাম্মুকিই করলুম। কিন্তু এবার সোজাসুজি, প্যারিস-লক্ষ্ণৌকে তিন-তালাক দিয়ে। বললুম, 'আমার কাছে আছে তিনটে কফি, একটা স্যানড়ুইচ আর পাঁচটি সিগরেটের দাম। কোনো কাফেতে গিয়ে একটু জিরোবেন?'

বলল, 'আমি শুধু কফি খাব।'

কাফেতে বসিয়ে বললুম, 'কফি-স্যানড়ুইচ খেয়ে বাড়ি যান।'

কিছু বলল না, আপত্তিও জানালো না।

কাফেতে কড়া আলোতে মেয়েটির চেহারা দেখে মনে হল এর দুর্বলতা না খেতে পেয়ে।

প্রেম অন্ধ কিন্তু প্যারিস তো প্রেমিক নয়। তবে সে এ-সুন্দরীকে উপোস করতে দিচ্ছে কেন? কিন্তু সে রহস্য সমাধানের জন্য একে প্রশ্ন করা বর্বরতা তো বটেই, তাই নিয়ে আপন মনে তোলপাড় করাও অনুচিত। পৃথিবীর অনাহার ঘোচাবার দাওয়াই যখন আমার হাতে নেই তখন রোগের কারণ জেনে কী হবে?

হঠাৎ মেয়েটি বলল, 'তুমি ভুল বুঝেছ, আমি বে—'

আমি বললুম, 'চুপ, আমি কিছু শুনতে চাইনে।'

বলল, 'তাই vous (আপনি) না বলে tu (তুমি) বললুম। তবে নতুন নেবেছি। কাল রাত্রে প্রথম। কিন্তু কেউ আমার কাছে ঘেঁষল না সাহস করে, আমার চেহারা তো ওরকম নয় আমি জানি। আমিও কাউকে সাহস করে 'বঁ সোয়ার' বলে নিমন্ত্রণ করতে পারিনি।'

মানুষের দম্ভের সীমা নেই। স্থির করেছিলুম কোনো প্রশ্ন শুধাব না, তবু নিজের কথা জানতে ইচ্ছে করল। বললুম, 'আজ আমাকেই কেন 'বঁ সোয়ার' বললেন?'

'বোধ হয় বিদেশী—না, কী জানি কেন। ঠিক বলতে পারব না।'

আমি বললুম, 'থাক, আমি সত্যি কিছু শুনতে চাইনে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আজ রাত্রে যে করেই হোক আমাকে খদ্দের যোগাড় করতেই হবে। আজ সকালেই ল্যান্ডলেডি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল।'

রাত ঘনিয়ে আসছে, আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'আপনি বাড়ি যান আর নাই যান, আমার সঙ্গে বসে থাকলে তো আপনার—। জানেন তো, পুরুষের সঙ্গে বসে আছেন দেখলে কেউ আপনার কাছে আসবে না। রাতও অনেক হয়েছে। এখন মাতালের সংখ্যা বেড়েই চলবে।'

কেঁপে ওঠেনি, কিন্তু তার মুখখানি একটু বিকৃত হল।

কোনো কথা কয় না। বড় বিপদে পড়লুম, বললুম, 'আমি তা হলে উঠি?' বলল, 'কেন? আমার সঙ্গে বসতে চাও না?'

আমি তাড়াতাড়ি মাপ চেয়ে বললুম, 'না, না, তা নয়। আপনাকে সত্যি বলছি। কিন্তু আমার সঙ্গে বসে থাকলে আপনার সময় যে বৃথায় যাবে।'

বলল, 'তুমি আমাকে কফি খাওয়ালে।'

কাতর হয়ে বললুম, 'প্লীজ, জিনিসটা ওরকম ধারা নেবেন না।'

'তা হলে তুমি আমাকে কফি খাওয়ালে কেন?'

আমি বললুম, 'প্লীজ, প্লীজ, এসব কথা বাদ দিন।'

বলল, 'কেউ তো খাওয়ায় না। না, তুমি বসো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার সত্যি ভালো লাগছে।'

এই দুঃখ-বেদনার মাঝখানেও এর সাহচর্য, সৌন্দর্য যে আমাকে টানছিল সে-কথা অস্বীকার করে আপন দাম বাড়াতে চাইনে।

বলল, 'আর জানো, তুমি চলে গেলেই আমাকে 'বঁ সোয়ারের' পাত্র খুঁজতে বেরুতে হবে। আমি আর সাহস পাচ্ছিনে।'

হায় অরক্ষণীয়া, তুমি কী করে জানলে প্যারিস কত রূঢ় কত নিষ্ঠুর।

বললুম, 'আজ তা হলে থাক না। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই। কোথায় থাকেন বলুন তো?'

'কাছেই, আভনীর হোটেলের পাশের গলিতে।'

খুশি হয়ে বললুম, 'তা হলে চলুন, আমি আভনীরেই থাকি।'

রাস্তায় চলতে চলতে সে আমার বাহু চেপে ধরল। হাতের আঙুল কোনো ভাষায় কথা বলে না বলেই সে অনেক কথা বলতে পারে। তার কিছুটা বুঝলুম, কিছুটা বুঝেও বুঝতে চাইলুম না। হঠাৎ মেয়েটার কেমন যেন মুখ খুলে গেল। বোধ হয় সেরাত্রে 'বঁ সোয়ার' বলার বিভীষিকা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে বলে। বলতে লাগল, পয়সা রোজগারের কত চেষ্টা সে করেছে, কত চাকরি সে পেয়েছে, তারপর যারা চাকরি দিয়েছে তারা কী চেয়েছে, কী রকম জোর করেছে, সে পালিয়েছে, আরো কত কী।

আর কী অদ্ভুত সুন্দর ফরাসী ভাষা! থাকতে না পেরে বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি এত সুন্দর ফরাসী বলেন!'

ভারি খুশি হয়ে গর্ব করে বলল, 'বাঃ, দোদে পরিবারের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল যে।'

তাই বলো। আলফঁস দোদের মতো কটা লোক ফরাসী লিখতে পেরেছে।

হোটেল পৌঁছতে পৌঁছতে সে অনেক কথা বলে ফেলল।

হোটেলে পেরিয়ে মেয়েটির বাড়ি যেতে হয়। দরজার সামনে সে দাঁড়াল। আমি বললুম, 'চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।' বলল, 'না।' আমি বললুম 'সে কী?' উত্তর না পেয়ে বললুম, 'তা হলে বন্ ন্যুই—শুভরাত্রি—তুমি এইটুকু একাই যেতে পারবে।'

শেকহ্যান্ড করার জন্য তার হাত ধরেছিলুম। সে হাত ছাড়লো না। মাথা নীচু করে বলল, 'তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো।'

আমাকে বোকা বলুন, মেয়েটিকে ফন্দিবাজ বলুন, যা আপনাদের খুশি, কিন্তু আমার ধর্মসাক্ষী, আমি তাকে খারাপ বলে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারলুম না। বললুম,

'আমার সামর্থ্য নেই যে তোমাকে সত্যিকার সাহায্য করতে পারি, কিন্তু তোমাকে ভগবান যে সৌন্দর্য দিয়েছেন তাকে বাঁচাতে পারলে যে-কোনো লোক ধন্য হবে।' 'ভগবান' শব্দটা প্যারিসের পথে বড় বেখাপ্পা শোনালো।

মেয়েটি মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, 'কী হবে বৃথা উপদেশ দিয়ে। তুমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।'

আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। ডাগর ডাগর দু চোখ আমাকে কী বলল সে কথা আজও ভুলিনি। আমার দিকে ও-রকম করে আর কেউ কখনো তাকায়নি।

তারপর আস্তে আস্তে সে আপন বাড়ির দিকে রওয়ানা হল।

আমি মুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখলুম, তার সমস্ত দেহটি আপন অসীম সৌন্দর্য বহন করে চলেছে রাজরানীর মতো সোজা হয়ে, আর মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে বেদনা আর ক্লান্তির ভারে।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই মনে হল, ভুল করেছি। মানুষ সাহায্য করতে চাইলে সর্বাবস্থায়ই সাহায্য করতে পারে। নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাল, এত সোজা কথাটা কাল রাত্রে বুঝতে পারলুম না কেন।

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে মেয়েটির—কী মূর্খ আমি, নামটি পর্যন্ত জিজ্ঞেস করিনি—সন্ধানে বেরুতে যাবার মুখে হোটেলের পোর্টার আমাকে একটি ছোট পুলিন্দা দিল।

খুলতেই একখানা চিঠি পেলুম:

'বন্ধু, তোমার কথাই মেনে নিলুম। আজ পাঁচটার ট্রেনে আমি গ্রামে চললুম। সেখানেও আমার কেউ নেই। তবু উপবাসে মরা প্যারিসের চেয়ে সেখানেই সহজ হবে। বিনা টিকিটেই যাচ্ছি।

তোমাকে দেবার মতো আমার কিছু নেই, এই সুয়েটারটি ছাড়া। ভগবানেরই দয়া, তোমার গায়ে এটা হবে।

জ্যুলি'

বেঁচে থাকো সর্দি-কাশি

ভয়ঙ্কর সর্দি হয়েছে। নাক দিয়ে যা জল বেরুচ্ছে তা সামলানো রুমালের কর্ম নয়। ডবল সাইজ বিছানার চাদর নিয়ে আগুনের কাছে বসেছি। হাঁচছি আর নাক ঝাড়ছি, নাক ঝাড়ছি আর হাঁচছি। বিছানার চাদরের অর্ধেকখানা হয়ে এসেছে, এখন বেছে বেছে শুকনো জায়গা বের করতে হচ্ছে। শীতের দেশ, দোর-জানলা বন্ধ, কিচ্ছু খোলার উপায় নেই। জানলা খুললে মনে হয় গৌরীশঙ্করের চুড়োটি যেন হিমালয় ত্যাগ করে আমার ঘরে নাক গলাবার তালে আছেন।

জানি, একই রুমালে বারবার নাক ঝাড়লে সর্দি বেড়েই চলে, কিন্তু উপায় কী? দেশে হলে রকে বসে বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়তুম, এ নোংরামির হাত থেকে রক্ষা তো পেতুমই, নাকটাও কাপড়ের ঘষায় ছড়ে যেত না।

হঠাৎ মনে পড়ল পরশু দিন এক ডাক্তারের সঙ্গে অপেরাতে আলাপ হয়েছে। ডাকসাইটে ডাক্তার—ম্যুনিক শহরে নাম করতে পারাটা চাট্টিখানি কথা নয়। যদিও জানি ডাক্তার করবে কচু, কারণ জর্মন ভাষাতেই প্রবাদ আছে, 'ওষুধ খেলে সর্দি সারে সাত দিনে, না খেলে এক সপ্তায়।'

তবু গেলুম তাঁর বাড়ি। আমার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কী। আমি শুধালুম, 'সর্দির ওষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরুচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওডার।'

ডাক্তার যদিও জর্মন, তবু হাত দুখানি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন ফরাসিস কায়দায়। বললেন, 'অবাক করলেন স্যর! সর্দির ওষুধ নেই? কত চান? সর্দির ওষুধ হয় হাজারো রকমের।'

বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খুললেন লালকেল্লার সদর দরজা পরিমাণ এক আলমারি। চৌকো, গোল, কোমর-মোটা, পেট-ভারি বাহান্ন রকমের বোতল-শিশিতে ভর্তি। নানা রঙের লেবেল আর সেগুলোর উপর লেখা রয়েছে বিকট বিকট সব লাতিন নাম।

এবারে খানদানী ভিয়েনীজ কায়দায় কোমরে দু ভাঁজ হয়ে বাও করে বাঁহাত পেটের

উপর রেখে ডান হাত দিয়ে তলোয়ার চালানোর কায়দায় দেরাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি দেখিয়ে বললেন, 'বেছে নিন, মহারাজ (কথাটা জর্মন ভাষায় চালু আছে), সব সর্দির দাওয়াই।'

আমি সন্দিগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে তাকালুম। ডাক্তার মুখব্যাদান করে পরিতোষের ঈষৎ হাস্য দিয়ে গালের দুটি টোল খোলতাই করে দিয়েছেন—হাঁ-টা লেগে গিয়েছে দু কানের ডগায়।

একটা ওষুধের কটমটে লাতিন নাম অতি কষ্টে উচ্চারণ করে বললুম, 'এর মানে তো জানিনে।'

সদয় হাসি হেসে বললেন, 'আমিও জানিনে, তবে এটুকু জানি, ঠাকুরমা-মার্কা কচু-ঘেঁচু মেশানো দিশী দাওয়াই মাত্রেরই লম্বা লম্বা লাতিন নাম হয়।'

আমি শুধালুম, 'খেলে সর্দি সারে?'

বললেন, 'গলায় একটু আরাম বোধ হয়, নাকের সুড়সুড়িটা হয়তো একটু-আধটু কমে। আমি কখনো পরখ করে দেখিনি। সব পেটেন্ট ওষুধ— নমুনা হিসেবে বিন-পয়সায় পাওয়া। তবে সর্দি সারে না, এ কথা জানি।'

আমি শুধালুম, 'তবে যে বললেন, সর্দির ওষুধ আছে?'

বললেন, 'এখনো বলছি আছে, কিন্তু সর্দি সারে সে কথা তো বলিনি।'

বুঝলুম, জর্মনি কান্ট-হেগেলের দেশ। বললুম, 'অ!'

ফিসফিস করে ডাক্তার বললেন, 'আরেকটা তত্ত্বকথা এইবেলা শিখে নিন। যে ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন, সে ব্যামো ওষুধে সারে না।'

ততক্ষণে আবার আমি হাঁচ্ছো হাঁচ্ছো আরম্ভ করে দিয়েছি। নাকচোখ দিয়ে এবার আর রাইন-ওডার না, এবারে পদ্মা-মেঘনা। ডাক্তার ডজন দুই কাগজের রুমাল আর একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ধাক্কাটা সামলে উঠে প্রাণভরে জর্মন সর্দিকে অভিসম্পাত দিলুম।

দেখি, ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছেন।

আমার মুখে হয়তো একটু বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। বললেন, 'সর্দি-কাশির গুণও আছে।'

আমি বললুম, 'কচু, হাতি, ঘন্টা!'

বললেন, 'তর্জমা করে বলুন।'

আমি বললুম, 'কচুর লাতিন নাম জানিনে। হাতি হল 'এলেফান্ট' আর 'ঘন্টা' মানে 'গ্লকে'।'

'মানে?'

'আর বুঝে দরকার নেই, এগুলো কটুবাক্য।'

আকাশপানে হানি যুগলভুরু বললেন, 'অদ্ভুত ভাষা! হাতি আর ঘন্টা গালাগাল হয় কী করে? একটা গল্প শুনবেন? সঙ্গে গরম ব্রান্ডি?'

আমি বললুম, 'প্রথমটাই চলুক। মিক্স করা ভালো নয়।'

ডাক্তার বললেন, 'আমি ডাক্তারি শিখেছি বার্লিনে। বছরতিনেক প্র্যাকটিস করার পর একদিন গিয়েছি স্টেশনে, বন্ধুকে বিদেয় দিতে। ফেরার সময় স্টেশন-রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি একটা ব্রান্ডি খাব বলে।

ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। দেখি, এক কোণে এক অপরূপ সুন্দরী। অত্যন্ত সাদাসিধে বেশভূষা—গরীব বললেও চলে—আর তাই বোধ হয় সৌন্দর্যটা পেয়েছে তার চরম খোলতাই। নর্থ সী দেখেছেন? তবে বুঝতেন হবো-হবো সন্ধ্যায় তার জল কী রকম নীল হয়—তারই মতো সুন্দরীর চোখ। দক্ষিণ ইটালিতে কখনো গিয়েছেন? না? তবে বুঝতেন সেখানে সোনালি রোদে রূপালি প্রজাপতির কী রাগিণী। তারই মতো তাঁর ব্লন্ড চুল। ডানয়ুব নদী দেখেছেন? না? তা হলে আমার সব বর্ণনাই বৃথা।'

আমি বললুম, 'বলে যান, রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।'

'না, থাক। ওরকম বেয়ারিং পোস্টের বর্ণনা দিতে আমার মন মানে না। আমরা ডাক্তার-বদ্যি মানুষ, ভাষা বাবদে মুখ্যু-সুখ্যু। অনেক মেহন্নত করে যে একটি মাত্র বর্ণনা কব্জায় এনেছি সেইটেও যদি না বোঝেন তবে আমার শোকটা কোথায় রাখি বলুন তো।'

কাতর হয়ে বললুম, 'নিরাশ করবেন না।'

'তবে চলুক থ্রি-লেগেড রেস। ডানয়ুব নদীর শান্ত-প্রশান্ত ভাবখানা তাঁর মুখের উপর। অথচ জানেন, ডানয়ুব অগভীর নদী নয়। আর ডানয়ুবের উৎপত্তিস্থল দেখেছেন? না। তাহলে বুঝতেন সেখানে তন্বঙ্গী ডানয়ুব যে রকম লাজুক মেয়ের মতো এঁকেবেঁকে আপন শরীর ঢাকতে ব্যস্ত, এ-মেয়ের মুখে তেমনি ছড়ানো রয়েছে লজ্জার কেমন যেন একটা আঁকুবাঁকু ভাব।

এই লজ্জা ভাবটার উপরই আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। কারণ আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, লজ্জা-শরম বলতে আমরা যা কিছু বুঝি সেসব মধ্যযুগের পুরনো গল্প থেকে। বেয়াত্রিচে দান্তেকে দেখে লাজুক হাসি হেসেছিলেন—আমরা তাই নিয়ে কল্পনার জাল বুনি, আজকের দিনে এসব তো আর বার্লিন শহরে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের নাইটদের শিভালরি গেছে, আর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে মেয়েদের মুখ থেকে সব লজ্জা সব ব্রীড়া।

কিন্তু আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই এখনো এই মধুর জিনিসটি দেখতে পাওয়া যায়, আর

তার চেয়েও নিশ্চয়, আপনার দেশের লোক এখনো অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে।

তাই আপনি বিশ্বাস করবেন, কিন্তু আমি নিজে এখনো করতে পারিনি, কী করে আমার তখন মনে হল, এ-মেয়েকে না পেলে আমার চলবে না।

হাসলেন না যে? তার থেকেই বুঝলুম, আপনি ওকীবহাল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন। কিন্তু জর্মনরা আমার এ-অবস্থার কথা শুনে হাসে। আর হাসবেই বা না কেন? চেনা নেই, শোনা নেই, বিদ্যাবুদ্ধিতে মেয়েটা হয়তো অফিসবয়ের চেয়েও আকাট, হয়তো মাতালদের আড্ডায় বিয়ার বিক্রি করে পয়সা কামায়, কিম্বা এও তো হতে পারে যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এ-সব কোনো কিছুর তত্ত্ব-তাবাশ না করে এক ঝটকায় মনস্থির করে ফেলা, এ-মেয়ে না হলে আমার চলবে না! আমি কি খামখেয়ালির চেঙ্গিস খান না হাজারো প্রেমের ডন জুয়ান?

ভাবছি আর মাথার চুল ছিঁড়ছি—কোন অজুহাতে কোন অছিলায় এঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।

কিছুতেই কোনো হদীস পাচ্ছিনে, আমাদের মাঝখানে তিনখানা মাত্র ছোট্ট টেবিলের যে উত্তাল সমুদ্র সেটা পেরিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছই কী প্রকারে। প্রবাদ আছে, প্রেমে পড়লে বোকা নাকি বুদ্ধিমান হয়ে যায়—প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য তখন তার ফন্দি-ফিকিব আর আবিষ্কার কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায়, আর বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পড়লে হয়ে যায় একদম গবেট—এমন সব কাণ্ড তখন করে বসে যে দশজন তাজ্জব না মেনে যায় না, এ লোকটা এসব পাগলামি করছে কী করে।

এ জীবনে সেই সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে আমি বুদ্ধিমান, কারণ পূর্ণ একঘন্টা ধরে ভেবে ভেবেও আমি সামান্যতম কৌশল আবিষ্কার করতে পারলুম না, আলাপ করি কোন কায়দায়। কিন্তু এহেন হৃদয়াভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না। তখন বরঞ্চ বোকা বনতে পারলেই হয়তো কোনো একটা কৌশল বেরিয়ে যেত।

ফ্রলাইন উঠে দাঁড়ালেন। কী আর করি। পিছু নিলুম। তিনি গিয়ে উঠলেন ম্যুনিকের গাড়িতে। আমিও ছুটে গিয়ে টিকিট কাটলুম ম্যুনিকের। কিন্তু এসে দেখি সে কামরার আটটা সীটই ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আরো প্রমাণ হয়ে গেল, আমি বুদ্ধিমান, কারণ এ কথা সবাই জানে, বুদ্ধিমানকে ভগবান সাহায্য করলে এ-পৃথিবীতে বোকাদের আর বাঁচতে হতো না। আমি ভগবানের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলুম না।'

আমি বললুম, 'ভগবানকে দোষ দিচ্ছেন কেন? এতো কন্দর্প ঠাকুরের ডিপার্টমেন্ট।'

বললেন, 'তাতেই বা কী লাভ? তিনি তো অন্ধ। মেয়েটাকে বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরই

মতো অন্ধ। এই যে আমি-একটা এত বড় অ্যাপলো, আমার দিকে একবারের তরে ফিরেও তাকালো না। ওঁকে ডেকে হবে—'

আমি বললুম, 'কচু, হাতি, ঘন্টা!'

এবার ডাক্তার বাঙলা কটুকাটব্যের কদর বুঝলেন। বললেন, 'আহা-হা-হা।' তারপর জর্মন উচ্চারণে বললেন, 'কশু, হাটি, গন্টা! খাসা গালাগাল।'

আমি বললুম, 'কামরাতে আটজনের সীট ছিল তো বয়েই গেল। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আপনি কোনো গতিকে ধাক্কাধাক্কি করে—'

বললেন, 'তাজ্জব করালেন। একি আপনার ইন্ডিয়ান ট্রেন, না সাইবেরিয়াগামী প্রিজনার-ভ্যান! চেকার পত্রপাঠ কামরা থেকে বের করে দেবে না?

দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরের করিডরে ঠায়। দেখি, মেয়েটি যদি খানা-কামরায় যায়। স্টেশনে তো খেয়েছে শুধু কফি। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটলো, কত লোক কত কামরা থেকে উঠলো-নামলো কিন্তু আমার স্বর্গপুরী থেকে কোনো—(কটুবাক্য) নামলো না। সব ব্যাটা নিশ্চয়ই যাচ্ছে ম্যুনিক। আর কোথাও যেতে পারে না? ম্যুনিক কি পরীস্থান না ম্যুনিকের ফুটপাথ সোনা দিয়ে গড়া? অবাক করলে এই ইডিয়টগুলো।

প্রেমে পড়লে নাকি ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। একবেলার জন্য হয়তো পায়। আমি লাঞ্চ খাইনি, ওদিকে ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে—আমার পেটের ভিতর হুলুধ্বনি জেগে উঠেছে। এমন সময় মা-মেরির করুণা হল। মেয়েটি চলল খানা-কামরার দিকে। আমিও চললুম ঠিক পিছনে পিছনে। আহা, যদি একটা হোঁচট খেয়ে আমার উপর পড়ে যায়। দুত্তোর, তারও উপায় নেই—উঁচু হিলের জুতো হলে গাড়ির কাঁপুনিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—এ পরেছে ক্রেপ-সোল।

ঠিক পিছনে পিছনে গিয়ে খানা-কামরায় ঢুকলুম। ওয়েটারটা ভাবলে স্বামী-স্ত্রী। না হলে তরুণ-তরুণী মুখ গুমসো করে খানা-কামরায় ঢুকবে কেন? বসালো নিয়ে একই টেবিলে—মুখোমুখি। হে মা-মেরি, নৎর্ দাম্ গির্জেয় তোমার জন্য আমি একশটা মোমবাতি মানত করলুম। দয়া করো মা, একটা কিছু ফিকির বাৎলাও আলাপ করবার।

বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান, কোনো সন্দেহ নেই আমি বুদ্ধিমান। কোনো ফিকিরই জুটলো না, অথচ মেয়েটি বসে আছে আমার থেকে দু হাত দূরে এবং মুখোমুখি। দু হাত না হয়ে দু লক্ষ যোজনও হতে পারত—কোনো ফারাক হত না।

জানলা দিয়ে একঝটকা কয়লার গুঁড়ো এসে টেবিলের উপর পড়ল। মেয়েটি ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাতেই আমি ঝটিতি জানলা বন্ধ করতে গিয়ে করে ফেললুম আরেক কাণ্ড। ঠাস করে জানলাটা বুড়ো আঙুলের উপর পড়ে সেটাকে দিল থেঁতলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত।

মা-মেরির অসীম দয়া যে কাণ্ডটা ঘটলো। মেয়েটি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'দাঁড়ান আমি ব্যান্ডেজ নিয়ে আসছি।'

আমি নিজে ডাক্তার, বিবেচনা করুন অবস্থাটা। রুমাল দিয়ে চেপে ধরলুম আঙুলটাকে। মেয়েটি ছুটে নিয়ে এল কামরা থেকে ফার্স্ট এডের ব্যান্ডেজ। তারপর আঙুলটার তদারকি করল শাস্ত্রসম্মত ডাক্তারি পদ্ধতিতে। বুঝলুম মেডিকেল কলেজে পড়ে। ঝানু ডাক্তার ফার্স্ট এডের ব্যান্ডেজ বয়ে বেড়ায় না, আর আনাড়ি লোক এরকম ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারে না।

আমি তো, 'না, না,' 'আপনি কেন মিছে মিছে,' 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ', 'উঃ, বড্ড লাগছে,' 'এতেই হবে,' 'ব্যস ব্যস' করেই যাচ্ছি আর সেই লিলির মতো সাদা হাতের পরশ পাচ্ছি। সে কী রকম মখমলের হাত জানেন? বলছি। আপনি কখনো রাইনল্যান্ড গিয়েছেন? না? থাক। ভুলেই গিয়েছিলুম, প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনাকে কোনো বর্ণনা দেব না।

প্রথম পরশে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়, বলে না? বড় খাঁটি কথা। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার হাতে কোনোপ্রকারের স্পর্শকাতরতা থাকার কথা নয়, তবু আমার যে কী অবস্থাটা হয়েছিল আপনাকে সেটা বোঝাই কী করে? মেয়েটি বোধ হয় টের পেয়েছিল, কারণ একবার চকিতের তরে ব্যান্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিল।

তাতে ছিল বিস্ময়, প্রশ্ন এবং হয়তো বা একটুখানি, অতি সামান্য, খুশির ঝিলিমিলি। তবে কি আমার হাতের স্পর্শ—? কোন সাহসে এ-বিশ্বাস মনের কোণে ঠাঁই দিই বলুন।'

আমি গুনগুন করে বললুম,

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে।'

ডাক্তার বললেন, 'খাসা মেলডি তো। মানেটাও বলুন।'

বললুম, 'আফটার ইউ। আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

বললেন, 'গল্প নয় স্যর, জীবনমরণের কথা হচ্ছে।'

আমি শুধালুম, 'কেন, সেপ্টিকের ভয় ছিল নাকি?'

রাগের ভাব করে বললেন, 'ইয়োরোপে এসে আপনার কি সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে? আমাকে হেনেছে প্রেমের বাণ আর আপনি বলছেন অ্যান্টিসেপ্টিক আন।'

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না।'

বললেন, 'তারপর আমি সুযোগ পেয়ে আরম্ভ করলুম নানারকমের কথা কইতে।

গোল গোল। আমি যে পরিচয় করার জন্য জান-কবুল সেটা ঢেকে চেপে। সঙ্গে সঙ্গে কখনো নুনটা এগিয়ে দিই, কখনো ক্রুয়েটটা সরিয়ে নিই, কখনো বা বলি, 'মাছটা খাসা ভেজেছে, আপনি একটা খান না, ওহে খানসামা এদিকে—ইত্যাদি।

করে করে সুন্দরীর মনটা একটু মোলায়েম করতে পেরেছি বলে মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল।

মেয়েটি লাজুক বটে কিন্তু ভারি ভদ্র। আমার ভ্যাজর-ভ্যাজর কান পেতে শুনলো, দু'একবার ব্লাশ করলো, সে যা গোলাপি—আপনি কখনো, না, থাক।

কিন্তু খেলো মাত্র একটি অমলেট আর দু স্লাইস রুটি। নিশ্চয়ই গরীব। ক্ষীণ আশাটার গায়ে একটু গত্তি লাগল।' এমন সময় ডাক্তারের অ্যাসিস্টান্ট এসে জানালো রুগী এসেছে। ডাক্তার বললেন, 'এখখুনি আসছি।'

ফিরে এসে কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'ম্যুনিক নাবলুম একবস্ত্রে। এমন ভান করে কেটে পড়লুম যাতে মেয়েটি মনে করে আমি ভ্যান থেকে মাল নামাতে গেলুম। যখন 'গুড বাই' বলে হাত বাড়ালুম তখন সে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। প্রেমে পড়লে নাকি মানুষের পাখা গজায়—হবেও বা, কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি মানুষ তখন চোখে-মুখে এমন সব নতুন ভাষা পড়তে পারে যার জন্য কোনো শব্দরূপ-ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হয় না। তবে সে পড়াতে ভুল থাকে বিস্তর, কাকতালীয় এন্তার।

আমি দেখলুম, লেখা রয়েছে 'বিষাদ' কিন্তু পড়লুম, 'এই কি শেষ।'

আমিও অবাক হয়ে শুধালুম, 'বার্লিন থেকে ম্যুনিক অবধি হামলা করে স্টেশনে খেই ছেড়ে দিলেন?'

ডাক্তারদের বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আদপেই না। কিন্তু কী আর দরকার পিছু নিয়ে? মেডিকেল কলেজে পড়ে, ওতেই ব্যস।

সেদিনই গেলুম মেডিকেল কলেজের রেস্তোরাঁয়। লাঞ্চ খেতে নিশ্চয়ই আসবে। এবারে মেয়েটি আর লজ্জা দিয়ে মনের ভাব ঢাকতে পারল না। আমাকে দেখা মাত্র আপন অজানতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে যে খুশি ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না, ভগবান মাঝে মাঝে বুদ্ধিমানকেও সাহায্য করেন।

ততক্ষণে মেয়েটি তার আপন-হারা আচরণটাকে সামলে নিয়েছে—লজ্জা এসে আবার সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলেছে।'

ডাক্তার খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'এখানেই যদি শেষ করা যেত তবে মন্দ হতো না, কিন্তু সর্দি-কাশির তো তা হলে কোনো হিল্লে হয় না। তাই কমিয়ে-সমিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই।'

আমি বললুম, 'কমাবেন না। তালটা একটু দ্রুত করে দিন। আমাদের দেশের ওস্তাদরা প্রথম খানিকটে গান করেন বিলম্বিত একতালে, শেষ করেন দ্রুত তেতালে।'

ডাক্তার বললেন, 'দুঃখিনী মেয়ে। বাপ-মা নেই। এক খাণ্ডার পিসির বাড়িতে মানুষ হয়েছে। দু'মুঠো খেতে দেয় পবতে দেয়, ব্যস। কলেজের ফীজটি পর্যন্ত বেচারি যোগাড় করে মাস্টারি করে।

তাতে আমার কিছু বলাব নেই, কিন্তু আমার ঘোরতর আপত্তি এভাকে বুড়ি এমনি নজরবন্দ করে রেখেছে যে চকিতা হরিণীর মতো সমস্তক্ষণ সে শুধু ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়. ঐ বুঝি পিসি দেখে ফেলল সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইছে। আমি তো বিদ্রোহ করে বললুম, একি বুখারার হারেম, না তুর্কী পাশার জেনানা? এ অত্যাচার আমি কিছুতেই সইব না। এভা শুধু আমার হাত ধরে বলে, প্লীজ, প্লীজ, তুমি একটু বরদাস্ত করে নাও। আমি তোমাকে হারাতে চাইনে। এর বেশি সে কক্‌খনো কিছু বলেনি।

এই মোকামে পৌঁছতে আমার লেগেছিল ঝাড়া একটি মাস। বিবেচনা করুন। সাত দিন লেগেছিল প্রেম নিবেদন করতে। পনরো দিন লেগেছিল হাতখানি ছুঁতে। তারো এক সপ্তাহ পরে সে আমায় বললে কেন সে এমন ভয়ে ভয়ে ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়।

থিয়েটার-সিনেমা মাথায় থাকুন, আমার সঙ্গে রাস্তায় পর্যন্ত বেরতে রাজি হয় না— পাছে পিসি দেখে ফেলে। আমি একদিন থাকতে না পেরে বললুম, তোমার পিসির কি কুইনটুপ্লেট আছে নাকি যে তারা ম্যুনিকের সব স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তোমার উপর নজর রাখছে? উত্তরে শুধু কাতর স্বরে বলে, প্লীজ, প্লীজ।

যা-কিছু আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা-আত্মীয়তা সব ঐ কলেজ-রেস্তোরাঁয় বসে। সেখানে ভিড় সার্ডিন-টিনের ভিতর মাছের মতো। চেয়ারে-চেয়ারে ঠাসাঠাসি, কিন্তু তার হাতে যে হাতখানা রাখব তারও উপায় নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে।'

আমি বললুম—

'সমুখে রয়েছে সুধাপারাবার,
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার—
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।।'

ডাক্তার বললেন, 'মানে বলুন।'

আমি বললুম, 'আপ যাইয়ে, পরে বলবো।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই ভিড়ের মাঝখানে, কিম্বা করিডরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আলাপচারি। করিডরে কথা কওয়া যায় প্রাণ খুলে কিন্তু তবু আমি রেস্তোরাঁর ভিড়ই পছন্দ করতুম বেশি কারণ সেখানে দৈবাৎ, ক্বচিৎ কখনো এভা তার ছোট্ট জুতোটি দিয়ে আমার পায়ের উপর দিত চাপ।

তার মাধুর্য আপনাকে কী করে বোঝাই? এভাকে পরে নিবিড়তর করে চিনেছি কিন্তু সেই পায়ের চাপ যে আমাকে কত কথা বলেছে, কত আশ্বাস দিয়েছে সেটা কী করে বোঝাই?

'হয়তো তার চেনা কোনো এক ছোকরা স্টুডেন্ট এসে হাসিমুখে তাকে দুটি কথা বললে। অত্যন্ত হার্মলেস। আমি কিন্তু হিংসেয় জরজর! টেবিলের উপর রাখা আমার হাত দুটো কাঁপতে আরম্ভ করছে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিনে—

এমন সময় সেই পায়ের মৃদু চাপ।

সব সংশয়ের অবসান, সব দুঃখ অন্তর্ধান।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই আমার দুঃখ আর বেদনার অবধি রইল না। এই বিরাট ম্যুনিক শহরে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিভৃতে মনের ভার নামাচ্ছে, নিষ্ঠুর সংসারে লড়বার শক্তি একে অন্যের সঙ্গসুখ স্পর্শসুখ থেকে আহরণ করে নিচ্ছে, আর আমি তারই মাঝখানে এমন কিছুই করে উঠতে পারছিনে যাতে করে এভাকে অন্তত একবারের মতো কাছে টেনে আনতে পারি।

শেষটায় আর সইতে না পেরে একদিন এভাকে কিছু না বলে ফিরে গেলুম বার্লিন। সেখান থেকে লিখে জানালুম, ও রকম কাছে থেকে না পাওয়ার দুঃখ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—আমার নার্ভস একদম গেছে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা আমার কিছুতেই হয়ে উঠত না—তোমার মুখের কাতর ছবি আমার চলে আসার সব শক্তি নষ্ট করে ফেলত।'

আমি বললুম, 'আপনি তো দারুণ লোক মশাই! তবে হাঁ, আপনাদের নীটশেই বলেছেন, কড়া না হলে প্রেম মেলে না।'

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক উল্টো। কড়া হতে পারলে আমি ম্যুনিক থেকে পালাতুম না। পলায়ন জিনিসটা কি বীরের লক্ষণ? তা সে কথা থাক।

উত্তর পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই। সে চিঠিটি আমি এতবার পড়েছি যে তার ফুলস্টপ-কমা পর্যন্ত আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, সে চিঠিটির বক্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকলো।

আপনাদের দেশে অবিশ্বাস্য বলে কোনো জিনিস নেই—ভিখিরিকে মাথায় তুলে নিয়ে আপনাদের দেশে হাতি হামেশাই রাজা বানায়। কিন্তু জর্মনিতে তো সে রকম ঐতিহ্য নেই। চিঠিতে লেখা ছিল—

বেশি লিখব না—আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থির করেছি, তোমার ইচ্ছামতো তোমায়-আমায় একবার নিভৃতে দেখা হবে। তার পর বিদায়। যত দিন পিসি আছেন ততদিন আমি আর কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আসছে বুধবার দিন আমাদের

বাড়ির সামনে ফুটপাতে অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসব।'

ডাক্তার বললেন, 'বিশ্বাস হয় আপনার, যে মেয়ে পিসির ভয়ে আমার সঙ্গে কলেজ রেস্তোরাঁর বাইরে পর্যন্ত যেতে রাজি হত না, সে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আপন ঘরে?'

আমি বললুম, 'পীরিতি-সায়রে ডোবার পূর্বে যে রাধা সাপের ছবিমাত্র দেখেই অজ্ঞান হতেন সেই রাধাই অভিসারে যাওয়ার সময় আপন হাত দিয়ে পথের পাশের সাপের ফণা চেপে ধরেছেন পাছে সাপের মাথার মণির আলোকে কেউ তাঁকে দেখে ফেলে।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই বটে। তবে কি না আমি রাধার প্রেমকাহিনী কখনো পড়িনি। সে কথা থাক।

আমি ম্যুনিক পৌঁছলুম বুধবার দিন সন্ধ্যের দিকে। কয়লার গুঁড়োয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল বলে ঢুকলুম একটা পাবলিক বাথে স্নান করতে। টাবে বসে সর্বশরীর ডলাই-মলাই করে আর গরম জলে সেদ্ধ চিংড়িটার মতো লাল হয়ে যখন বেরলুম তখন আর হাতে বেশি সময় নেই। অথচ গরম টাব থেকে ও রকম হুট করে ঠাণ্ডায় বেরুলে যে সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে সর্দি হয় সে কথাও জানি। চানটা না করলেও যে হতো সে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম রাস্তায় বেরিয়ে, কিন্তু তখন আর আফসোস করে কোনো ফায়দা নেই। সেই ডিসেম্বরের শীতে চললুম এভার বাড়ির দিকে—মা-মেরির উপর ভরসা করে, যে এ যাত্রায় সর্দিটা নাও হতে পারে।'

আমি বললুম, 'আমরা বাঙলায় বলি, দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লুম।'

ডাক্তার বললেন, 'সাড়ে এগারোটার সময় গিয়ে দাঁড়ালুম এভার বাড়ির সামনের রাস্তায়। টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নীচে—আপনাদের পাগলা ফারনহাইটের হিসেবে বত্রিশের ঢের নীচে। রাস্তায় এক ফুট বরফ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর আমার চতুর্দিকে যে হিম ঘনাতে লাগলো তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে পারি আমাকে যেন কেউ একটা বিরাট ফ্রিজিডেরের ভিতর তালাবন্ধ করে রেখে দিল।

তিন মিনিট যেতে না যেতে নামল মুষলধারে—বৃষ্টি নয়—সর্দি। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনামাইট ফাটার হাঁচি—হাঁচ্চো, হাঁচ্চো, হাঁচ্চো। আপনার আজকের সর্দি তার তুলনায় নস্যি, অর্থাৎ নস্যির খোঁচায় নামানো আড়াই ফোঁটা জল। হাঁচি আর জল, জল আর হাঁচি।

কী করি, কী করি ভাবছি, এমন সময় এভা এসে নিঃশব্দে আমার হাত ধরলো—বরফের গুঁড়োর উপর পায়ের শব্দ শোনা যায় না। তার উপর সে পরেছে সেই ক্রেপ-সোলের জুতো—বেচারির মাত্র ঐ একজোড়াই সম্বল।

কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে,

করিডরের খানিকটে পেরিয়েই তার কামরা। নিঃশব্দে আমাকে সেখানে ঢুকিয়ে দরজায় খিল দিয়ে মাথা নীচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

এভার গোলাপি মুখ ডাচ পনিরের মতো হলদে, টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটি ব্লু-ডানয়ুবের মতো ঘন বেগুনি-নীল—ভয়ে, উত্তেজনায়।

আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আবার আমার সেই ডাইনামাইট ফাটানো হাঁচো, হাঁচো।

এভা আমাকে ধরে নিয়ে আমার মাথা গুঁজে দিল বিছানায়। মাথার উপর চাপালো বালিশ আর সব কখানা লেপ-কম্বল। বুঝতে পারলুম কেন। পাশের ঘরে পিসি যদি শুনতে পান তবেই হয়েছে। আমি প্রাণপণ হাঁচি চাপবার চেষ্টা করছি আর লেপ-কম্বলের ভিতর বম-শেল ফাটাচ্ছি।

কতক্ষণ এ রকম কেটেছিল বলতে পারব না। হাঁচির শব্দ কিছুতেই থামছে না। এভা শুধু কম্বল চাপাচ্ছে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম কিন্তু নিবিড় পুলকে বার বার আমার সর্বশরীর শিহরিত হচ্ছে—এভার হাতের চাপ পেয়ে।

এমন সময় দরজায় ধাক্কা আর নারীকণ্ঠের তীব্র চিৎকার, দরজা খোল!

পিসি!

আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি লেপের ভিতর থেকে বেরলুম। এভা ভয়ে ভিরমি গিয়েছে, খাটের উপর নেতিয়ে পড়েছে।

আমি দরজা খুলে দিলুম। সাক্ষাৎ শকুনির মতো বীভৎস এক বুড়ি ঘরে ঢুকে আমার দিকে না তাকিয়েই এভাকে বললো, কাল সকালেই তুই এ-বাড়ি ছাড়বি।

সঙ্গে সঙ্গে আর কী সব বকুনি দিয়েছিল, 'ঘেন্না,' 'কেলেঙ্কারি,' 'শোবার ঘরে পরপুরুষ,' 'রাস্তার মেয়ের ব্যাভার,' এই সব, সে আমার আর মনে নেই। বুড়ি আমার দিকে তাকায় না, গালের উপর গাল চড়ছে যেন ছ' গজী পিয়ানোর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি কেউ আঙুল চালাচ্ছে।

আমি আর থাকতে পারলুম না। বুড়ির দুই বাহু দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে বললুম, 'আমার নাম পেটার সেল্‌বাখ্। বার্লিনে ডাক্তারি করি। ভদ্রঘরের ছেলে। আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই।'

ডাক্তার বললেন, 'মা-মেরি সাক্ষী, আমি এভাবে বিয়ে করার প্রস্তাব এত দিন করিনি পাছে সে 'না' বলে বসে। আমি অপেক্ষা করছিলুম পরিচয়টা ঘনাবার জন্য। বিয়ের প্রস্তাবটা আমার মুখ দিয়ে যে তখন কী করে বেরিয়ে গেল আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

পিসি আমার দিকে হাবার মতো তাকালো—এক বিঘৎ চওড়া হাঁ করে। পাকা দু মিনিট তার লেগেছিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর ফুটে উঠল মুখের উপর খুশির পয়লা

ঝলক। সেটা দেখতে আরো বীভৎস। মুখের কোঁচকানো, এবড়ো-খেবড়ো গাল, ভাঙা-চোরা নাক-মুখ-ঠোঁট যেন আরো বিকৃত হয়ে গেল।

আমাকে জড়িয়ে ধরে কী যেন বলল ঠিক বুঝতে পারলুম না। তারপর হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল করিডরের দিকে। চিৎকার করে কাকে যেন ডাকছে।

এভা তখনো অচৈতন্য।

বুড়ি ফিরে এল বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে। তার চেহারার খুশির পিছনে দেখলুম সেই ভীত ভাব—এভার মুখে যেটা অষ্টপ্রহর লেপা থাকে। বুঝলুম, পিসির দাপটে এ বাড়ির সকলেরই কণ্ঠশ্বাস।

মনে হল বুড়ো খুশি হয়েছে এভা যে এ বাড়ির অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার জন্য। হায়, তার তো নিষ্কৃতি নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই দুপুর রাতে ওয়াইন এল, শ্যাম্পেন এল। হোটেল থেকে সসেজ কটলেট এল। হৈহৈ রৈরৈ। এভা সম্বিতে ফিরেছে। বুড়ো শ্যাম্পেন টানছে জলের মতো। বুড়ি এক গেলাসেই টং। আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু কাঁদে আর এভার বাপের কথা স্মরণ করে বলে, ভাই বেঁচে থাকলে আজ সে কী খুশিটাই না হতো!

আর এভা? আমাকে একবার শুধু কানে কানে বলল, 'জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার উপর একটু নজর রেখো।'

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন এক সুন্দরী—হ্যাঁ, সুন্দরী বটে।

একলহমায় আমি নর্থ সীর ঘন নীল জল, দক্ষিণ ইটালির সোনালি রোদে রূপালি প্রজাপতি, ডানয়ুবের শান্ত-প্রশান্ত ছবি, সেই ডানয়ুবের লজ্জাশীল দেহচ্ছন্দ, রাইনল্যান্ডের শ্যামলিমা মোহনীয়া ইন্দ্রজাল সব কিছুই দেখতে পেলুম।

আর সে কী লাজুক হাসি হেসে আমার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।

আমি মাথা নীচু করে ফরাসিস কায়দায় তাঁর চম্পক করাঙ্গুলি প্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে মনে মনে বললুম—

'বেঁচে থাকো সর্দি-কাশি
চিরজীবী হয়ে তুমি।'

মনোবীণা

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা-৭